পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি অধিকার শীর্ষক কর্মশালা

Workshop on Land Right Issues in Chittagong Hill Tracts

Organized by

HTNF, MfPFLR-CHT, Kapaeeng, Taungya, Maleya and MroChet

with the support of HRGG-PSU, RDE/Danida

Published on:
30 November 2005

Published by:

Hill Tracts NGO Forum
(An Association of CHT NGOs)
Rajbari Road, Rangamati-450000, Rangamati Hill District
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Tel: +880-351-62842, Fax: +880-351-61109, E-mail: htnf_cht@hotmail.com

Kapaeeng
(An Indigenous People's Human Rights Organization of Bangladesh)
E-mail: kapaeeng@yahoo.co.uk

Mro-Chet
Ujani Para, Badarban-460000, Bandarban Hill District
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Tel: +880-361-62194, E-mal: ranglai_mro@yahoo.com

Taungya
(An organization for Indigenous Culture, Environment & Socio-Economic Advancement)
Rajbari Road, Rangamati – 45000, Chittagong Hill Tracts, Bangladeah
Tel: 880-351-62111, E-mail: taungya_cht@yahoo.com

Movement for the Protection of Forest and Land Rights
C/o Taungya
Rajbari Road, Rangamati – 45000, Chittagong Hill Tracts, Bangladeah
Tel: 880-351-62111

Maleya
C/o Hill Tracts NGO Forum
Rajbari Road, Rangamati-450000, Rangamati Hill District
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Tel: +880-351-62842, Fax: +880-351-61109

Ackowledgement:
HRGG-PSU, RDE/Danida

Price: Taka 30.00, US $ 3.00

সূচীপত্র

□ অনুষ্ঠানসূচী

□ Background Paper of the Workshop

□ ডানিডার সহযোগিতায় ৬টি উন্নয়ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ভূমি বিষয়ে দু'দিন ব্যাপী কর্মশালা জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি কর্তৃক বন্ধ করার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত সাংবাদিক সম্মেলন

□ কর্মশালা বন্ধের সরকারী নির্দেশনামা

□ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্য

- স্বাগত বক্তব্যঃ ললিত চন্দ্র চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, হিল ট্র্যাক্টস্ এনজিও ফোরাম
- জনাব হোসেন শহীদ সুমন, প্রধান কর্মকর্তা, Human Rights and Good Governance, DANIDA
- মি. উষাতন্হা রোয়াজা, সদস্য, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
- মিঃ সুকৃতি রঞ্জন চাকমা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
- গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন

□ প্রবন্ধ ও মুক্ত আলোচনা

- পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে ভূমি বিরোধ - গৌতম কুমার চাকমা
- প্রশ্নোত্তর পর্ব ও মুক্ত আলোচনা
- ভূমি বন্দোবস্তী, হস্তান্তর, ইজারা ও অধিগ্রহণ পদ্ধতি - রাজা দেবাশীষ রায়/সুস্মিতা চাকমা
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু সমস্যা - সুধাসিন্ধু খীসা

□ Participants list of the workshop

□ আয়োজক সংগঠনের পরিচিতি

Workshop on Land Right Issues in Chittagong Hill Tracts

Co-organized by

HTNF, MfPFLR-CHT, Kapaeeng, Taungya, Maleya and MroChet

With the support of HRGG-PSU, RDE/Danida

23-24 November 2005, Sabarang Restaurant, Rangamati

অনুষ্ঠানসূচী

১ম দিন -২৩ নভেম্বর ২০০৫

০৯০০ - ০৯৩০ রেজিস্ট্রেশন

০৯৩০ - ১০০০ স্বাগত বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্দেশ্য-রাজা দেবাশীষ রায়
কর্মশালা উদ্বোধন - মিজ নাটালিয়া ফিনবার্গ

১০০০ - ১০৩০ পরিচিতি পর্ব

১০৩০ - ১০৪০ কর্মশালার অনুষ্ঠানসূচী উপস্থাপন - ফ্যাসিলিটেটর

১০৩০ - ১১০০ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সম্পর্কীয় বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে ভূমি বিরোধ - শ্রী গৌতম কুমার চাকমা

১১০০ - ১১১৫ চা বিরতি

১১১৫ - ১২০০ প্রশ্নোত্তর পর্ব

১২০০ - ১২৩০ ভূমি বন্দোবস্তী, হস্তান্তর, ইজারা ও অধিগ্রহণ পদ্ধতি - রাজা দেবাশীষ রায়/ সুস্মিতা চাকমা

১২৩০ - ১৩০০ প্রশ্নোত্তর পর্ব

১৩০০ - ১৪০০ দুপুরের খাবার

১৪০০ - ১৫৩০ বিষয়ভিত্তিক দলগত আলোচনা

১৫৩০ - ১৫৪৫ চা বিরতি

১৫৪৫ - ১৭০০ দলীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন

২য় দিন - ২৪ নভেম্বর ২০০৫

১০০০ - ১০৩০ মৌজা বন ও সংরক্ষিত বন এর উপর আলোচনা - শ্রী সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

১০৩০ - ১১১৫ প্রশ্নোত্তর পর্ব

১১১৫ - ১১৩০ চা বিরতি

১১৩০ - ১২০০ জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যার উপর আলোচনা - শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা

১২০০ - ১২৪৫ প্রশ্নোত্তর পর্ব

১২৪৫ - ১৩৪৫ দুপুরের খাবার

১৩৪৫- ১৪৩০ বিষয়ভিত্তিক দলগত আলোচনা

১৪৩০- ১৫০০ দলীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন

১৫০০ - ১৬৩০ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও সুপরিশমালা গ্রহণ

১৬৩০ - ১৭০০ চা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন (সমাপ্তি)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকাস্থ রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাসের উপ-প্রধান মিজ নাটালিয়া ফিনবার্গ কর্তৃক কর্মশালা উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি কর্মশালায় উপস্থিত হতে পারেননি। মিজ নাটালিয়া ফিনবার্গ-এর পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের সভাপতি মি. গৌতম দেওয়ান কর্মশালা উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, কর্মশালা চলাকালে কর্মশালা বন্ধের সরকারী নির্দেশনামা জারীর ফলে কর্মশালা কেবল ২৩ নভেম্বর কেবল অর্ধ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

Background Paper

Workshop on Land Right Issues in Chittagong Hill Tracts

1. Background:

The Chittagong Hill Tracts (CHT), southeastern part of Bangladesh, is the territory of 11 different indigenous peoples. Local indigenous peoples administered this region with special status until the independence of Bangladesh in 1971. For the reestablishment of the rights, the indigenous peoples had to go through struggle associated with armed struggle for a long more that two decades that was ended in 1997 through signing the CHT Accord. It is needless to mention that one of the main problems of CHT indigenous peoples is the territorial integrity. The indigenous peoples already lost their lands by so called development projects such as dam and forestation etc., projects by CHT Development Board. Moreover, in 1980s, thousands of Bengali families were brought and settled down on the lands of indigenous peoples by the government that compelled thousands of indigenous families to cross the border and took refuge in Tripura.

Although it has been six years after the signing of the Accord, no progress has been achieved regarding the solution of disputes over land. Land grabbing by the settlers with the help of the military is every day scenerio in the CHT now. Considering those situation, Hill Tracts NGO Forum (HTNF), in association with other CHT based organizations such as Movement for Protection of Forest and Land Rights, Taungya, Maleya, MroChet and Kapaeeng, an indigenous peoples human rights organization has initiated to hold a two day workshop followed by a one day field trip.

2. Objectives:

The objectives of the workshop are,

- To identify key land related issues, strategic priorities and possible programmes and initiatives for the intervention for the promotion and protection of the land rights of the CHT.
- To identify and assess the constraints and opportunities of various actors on the issues of land rights of the CHT at local, national and international level.
- To provide an opportunity for the CHT peoples to further strengthen their network on the issues of land at the local level.

3. Expected outcomes:

The following outcomes will be come out from the workshop:

- Land related issues of the CHT will be focused.
- Strategic priority issues to make possible intervention will be identified.
- Actors of land rights issues of the CHT and their constraints and opportunities will be assessed.
- The network of the CHT peoples for the promotion and protection of the land rights of the CHT will be strengthened.
- Finally, a consolidation report on the above outcome will be prepared.

ডানিডার সহযোগিতায় ৬টি উন্নয়ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ভূমি বিষয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মশালা জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি কর্তৃক বন্ধ করার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের
সম্মিলিত সাংবাদিক সম্মেলন

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

আমরা হিল ট্রাক্টস এনজিও ফোরাম, কাপেং, ম্রোচেট, বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন, মালেইয়া ও টংগ্যা এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬টি বেসরকারী সংগঠন ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০০৫ দু' দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। দু' দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতা, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানি যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছেন এবং সরকারের মন্ত্রী মহোদয়গণ বিভিন্ন সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংগীকার প্রদান করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভূমি। এই ভূমি সমস্যা সমাধান ব্যতীত পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করি। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা চিহ্নিত করা এবং ভূমি সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা তৈরী করা যা ভূমি কমিশন ও সরকারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২১ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের ২০১৬/জয়েন্ট অপস(এ)/১৩০৪ নং স্মারকমূলে রাংগামাটি জেলা প্রশাসক দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালা বন্ধের জন্য হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম'কে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি। আমরা মনে করি যে, সরকারের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে এবং এটি সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় হতে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্মশালা বন্ধের এই নির্দেশ আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে সকলেরই শান্তিপূর্ণভাবে যে কোন সভায় উপস্থিত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এমতাবস্থায় সরকারের কর্মশালা বন্ধের এই নির্দেশ পার্বত্যবাসীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের সামিল। আমরা মনে করি সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত মানবাধিকার, সুশাসন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং সরকারের এহেন গর্হিত সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যাহত করবে।

আমরা উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে বিষয়টি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানসহ মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও দেশবাসীর কাছে আহবান জানাচ্ছি।

১. মি. ললিত চন্দ্র চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম
২. মি. গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন (বভূঅসআ)
৩. এ্যাড. শক্তিমান চাকমা, সভাপতি, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম, রাঙামাটি জেলা কমিটি

৪. মি. শক্তিপদ ত্রিপুরা, সভাপতি, খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশন
৫. মি. সন্তোষিত চাকমা (বকুল), সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি
৬. মি সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ সম্পাদক, বভূঅসআ
৭. মিঃ মুক্ত রঞ্জন চাকমা, সম্পাদক, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম, খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি
৮. মি. রাংলাই ম্রো, সভাপতি, ম্রোচেট
৯. মি. উদ্ভাসন চাকমা, সদস্য সচিব, কাপেং
১০. এ্যড. ভবতোষ দেওয়ান, সম্পাদক, মালেইয়া
১১. মি. অম্লান চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, টংগ্যা
১২. মিঃ বিশ্ব কল্যাণ চাকমা, সভাপতি, ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম, খাগড়াছড়ি
১৩. জনাব মোহাম্মদ আলী আহম্মদ, সভাপতি, গ্লোবাল মিশন, বান্দরবান
১৪. মিজ টুকু তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক, বভূঅসআ
১৫. মি. জুমলিয়াম আমলাই বম, সভাপতি বম সোসাল কাউন্সিল
১৬. মি. অরুন লাইব্রেস, সভাপতি, খ্যাং কল্যাণ সংস্থা
১৭. মি. চাইথোয়াই মারমা, সভাপতি, ব্রাপা
১৮. এ্যাড. সুস্মিতা চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন, রাংগামাটি
১৯. মি অশোক কুমার চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, তৃণমূল
২০. মিঃ বিশ্ব প্রিয় কার্বারী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, খেদারমারা, বাঘাইছড়ি
২১. মিজ সাগরিকা রোয়াজা, উপদেষ্টা, ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন

কর্মশালা বন্ধের সরকারী নির্দেশনামা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
(জে, এম, শাখা)

স্মারক নং- জে.এম.-জি২৬/২০০৫/১২৭২ — তারিখঃ ২৬.১১.২০০৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ **"পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি অধিকার" শীর্ষক কর্মশালা বন্ধ করণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের২১ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের ২০১৬/জয়েন্ট অপস(এ)/১৩০৪ নং স্মারক।

২৩ ও ২৪ 'নভেম্বর ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বিষয়োক্ত কর্মশালা বন্ধ করার জন্য সূত্রোক্ত স্মারকে নির্দেশনা পাওয়া গেছে।

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে উক্ত কর্মশালা বন্ধ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল।

জেলা প্রশাসক
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রাপক ঃ ললিত চন্দ্র চাকমা
সম্পাদক
হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম
রাজবাড়ী সড়ক, রাংগামাটি।

স্মারক নং- জে.এম.-জি২৬/২০০৫/১২৭২ — তারিখঃ ২৬.১১.২০০৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। পুলিশ সুপার, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কোতয়ালী থানা, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

জেলা প্রশাসক
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি অধিকার শীর্ষক কর্মশালা

সাবারাং রেষ্টুরেন্ট, রাজবাড়ী রোড, রাঙ্গামাটি।
২৩-২৪ নভেম্বর ২০০৫

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২৩ নভেম্বর ২০০৫ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকাস্থ রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাসের উপ-প্রধান মিজ নাটালিয়া ফিনবার্গ কর্তৃক কর্মশালা উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি কর্মশালায় উপস্থিত হতে পারেননি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্মশালা উদ্বোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মিজ নাটালিয়া ফিনবার্গ-এর পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের সভাপতি মি. গৌতম দেওয়ানের মাধ্যমে কর্মশালা উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজ টুকু তালুকদার। নিম্নে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তাদের বক্তব্য পত্রস্থ করা হলো।

স্বাগত বক্তব্য ঃ ললিত চন্দ্র চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ইস্যু বিষয়ে আয়োজিত আজকের এই কর্মশালার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন গৌতম দেওয়ান, রিসোর্স পার্সন হিসেবে আছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য শ্রী গৌতম কুমার চাকমা, আরো উপস্থিত আছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি এবং ঐ পরিষদেরই মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুকৃতি রঞ্জন চাকমা, উপস্থিত আছেন রাংগামাটি জেলা পার্বত্য পরিষদের সম্মানিত সদস্য উষাতন রোয়াজা মহোদয়, উপস্থিত আছেন রাজকীয় ড্যানিশ এ্যাম্বাসির Human Rights and Good Governance-এর প্রধান কর্মকর্তা হোসেন শহীদ সুমন, উপস্থিত আছেন আমাদের হিল ট্র্যাক্টস্ এনজিও ফোরমের মাননীয় উপদেষ্টা শ্রী মঙ্গল কুমার চাকমা এবং উপস্থিত হয়েছেন তিন সার্কেলের প্রতিনিধিবৃন্দ, হেডম্যান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন চেয়ারম্যান, সদস্য এবং প্রতিনিধি, এই এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ এবং আরও রয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন থেকে, সবাইকে হিল ট্র্যাক্টস্ এনজিও ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন, কাপেং, ম্রোচেট, টংগ্যা ও মালেইয়াসহ আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী, এই এলাকার মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়ত যে কতগুলো সমস্যা/ইস্যু নিয়ে জর্জরিত হচ্ছি, হয়ে আসছি, তার মধ্যে ভূমি বিষয়টা সর্বপ্রথমে বলা চলে। এই ভূমি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানের জন্য আজকে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। আমি আশা করছি সুন্দর একটা সুপারিশ, সুন্দর একটা দিক নির্দেশনা আজকে শুরু হতে যাওয়া দু'দিন ব্যাপী কর্মশালার মধ্য দিয়ে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো।

আজকের এই অনুষ্ঠানটা উদ্বোধন করার কথা ছিল রয়েল ড্যানিশ এ্যাম্বেসি বাংলাদেশের ডেপুটি হেড অব মিশন মিজ্ নাটালিয়া ফিনবার্গ। তিনি খুব টাইট সিডিউল নিয়ে এখানে এসেছেন যার কারণে উনি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। উনার পরিবর্তে আজকের এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন মি. গৌতম দেওয়ান। আজকের কর্মশালায় হিল ট্র্যাক্টস্ এনজিও ফোরামের চেয়ারপার্সনের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। আশাকরি বিষয়টি আপনারা সবাই ক্ষমা সুন্দর বিবেচনায় নিয়েছেন । আমরা রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান

থেকে যে প্রতিনিধি নেতৃবৃন্দ এখানে এসেছি, আয়োজনে আমাদের অনেক ত্রুটি থাকতে পারে এই বিষয়গুলো সুন্দর ও সুবিবেচনার দৃষ্টিতে দেখার জন্যে আয়োজদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আরো আশা করবো এই কর্মশালাকে প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করার জন্যে নিজ নিজ মূল্যবান মতামত, পরামর্শ দিবেন। এই কর্মশালার শ্রীবৃদ্ধি করে এই কর্মশালার মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারবো। পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

জনাব হোসেন শহীদ সুমন, প্রধান কর্মকর্তা, Human Rights and Good Governance, DANIDA

মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং আলোচকবৃন্দ, সেই সাথে আমাদের সহযোদ্ধা বন্ধুরা যারা বিভিন্ন এনজিও বা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছেন সবাইকে শুভ সকাল।

আপনারা শুনেছেন যে, আমাদের ডেপুটি হেড অব মিশনের আজকের এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত থাকার কথা ছিল কিন্তু উনি একটি জরুরী কাজে আটকে যাওয়ায় আসতে পারেননি সেজন্য উনি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আমি উনার পক্ষ হয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করছি। তবে উনি আশ্বস্ত করেছেন যে, উনি যেভাবেই হোক সন্ধ্যায় যে প্রোগ্রামটি রয়েছে সে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন। সেটি যেহেতু অনেকটা informal হবে সেহেতু সবার সাথে interact করার অনেক সুযোগ থাকবে। উনি প্রতি বিষয়ে অংশগ্রহণ করবার বিশেষভাবে আশা প্রকাশ করেছেন, আশাকরি আপনারা তার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে আজকের কর্মশালার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আমি আশা করছি যে, এই দু'দিনের কর্মশালা থেকে আমাদের এই অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা আমরা সফলভাবে চিহ্নিত করতে পারবো এবং সেই সমস্যাগুলোকে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া বা পন্থা সেটি আমরা নির্ধারণ করতে পারবো এবং তার ভিত্তিতে আমরা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ করতে পারবো। এই কর্মশালাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এটি শুধু আপনাদের জন্য নয়, এই কর্মশালার সুপারিশ বা এই কর্মশালায় চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমস্ত উন্নয়ন অংশীদারদেরকে সমানভাবে সহযোগিতা করবে। এটি যেমনভাবে দাতা সংস্থাদেরকে তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে সহযোগিতা করবে ঠিক একইভাবে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এনজিওদেরও ভবিষ্যত কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে বা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমানভাবে সহায়তা করবে।

আমার আসলে এখানে কিছু বলবার কথা ছিল না, আমি এসেছি মূলতঃ একজন observer হিসেবে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আমার জ্ঞানের পরিধিকে আরো ধারালো করবার জন্য। আমার বলার কথা নয়, যদিও বলতে হচ্ছে। একজন মানবাধিকার কর্মী হিসাবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, এটি একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা। আদিবাসীদের যেহেতু এটি একদম সংস্কৃতির একটি অংশ, তাই আদিবাসীদের জন্য ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া অআদিবাসীদের জন্যও কিন্তু ভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি দেখেন আমাদের বাংলাদেশে প্রায় দেড় লক্ষ বিচারাধীন মামলা রয়েছে শুনানীর অপেক্ষায়। তার মোটামুটি ৮০% ভাগ মামলাই কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত। মানে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়েই মামলার উৎপত্তি হয় এবং এই সমস্ত মামলাগুলি বছরের পর বছর চলতে থাকে এবং এই মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে অনেকেই নিঃস্বও হয়ে যায়।

এই বিষয়টি কেবল পার্বত্য অঞ্চলে নয় এটি সব অঞ্চলের। আর পার্বত্য অঞ্চলে এটির সাথে আরও বিশেষ কিছু সমস্যা রয়েছে। আর আমার কাছে যেটা মনে হয়, মানবাধিকার কর্মী হিসেবে এই ধরনের বিষয়গুলো ভূমি ক্ষয় বা ভূমি দখল, বেদখল এই বিষয়গুলি খুব সুস্পষ্টভাবে ডকুমেন্টেড হওয়া

দরকার। সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং (Fact finding) এবং ডকুমেন্টেশনে (documentation)। আমরা বলছি বা দাবী করছি অমুকের ভূমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে বা অমুক ভূমি হারাচ্ছে, কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় হারাচ্ছে আমরা যদি কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান দেখতে চাই এটি কিন্তু instantly দেওয়া খুব difficult। কিন্তু আপনি যদি সরকারের সাথে বা এমনকি আপনি যদি মামলাও পরিচালনা করতে যান আপনার জন্যে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই কারণে এই পুরো বিষয়টাই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে documented হওয়া দরকার এবং তখনই আমরা এ্যাডভোকেসী করতে পারবো যে, এই লোকটি এভাবে তার ভূমি হারাচ্ছে এবং এটিকে এভাবে তার ভূমি তাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া সম্ভব বা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

আমি আশা করবো যে, দু'দিনের এই কর্মশালায় এই ডকুমেন্টেশনের (documentation) ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হবে। আমি আর আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং এ দু'দিনের কর্মশালা অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে এই আশা করে ও সফলতা কামনা করে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি. উষাহ্লা রোয়াজা, সদস্য, রাংগামাটি জেলা পরিষদ

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের যারা এই কর্মশালা আয়োজন করেছেন তাদেরকে। আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাংগামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম দেওয়ান মহোদয়, উপস্থিত আছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সদস্য শ্রী গৌতম কুমার চাকমা, উপস্থিত আছেন আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং তিন পার্বত্য জেলা থেকে আগত শ্রদ্ধাভাজন হেডম্যান, কার্বারী, চেয়ারম্যান সবাইকে জানাচ্ছি রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নমস্কার।

আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে আপনারা সবাই কম বেশী হলেও অবগত আছেন যে, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি নিয়ে একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এখান থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি তারই আলোকে আজকের এই আয়োজন, এই আলোচনা সভা। তবে আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা অতিথি আছেন আমার মনে হয় কমবেশী সবার কিছুটা হলেও জানা আছে যে, আমরা সম্ভবতঃ দুই কি তিন বছর আগে একবার এই ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রদ্ধাভাজন গৌতম দেওয়ানের উদ্যোগে পার্বত্য জেলা পরিষদে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। তখনও বিশেষ করে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তারই উত্তরসূরী হিসেবে আজকের এই আয়োজন।

আজকের এই অনুষ্ঠানকে যেন আমরা সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারি এবং আজকের এই দু'দিনের কর্মশালার মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেহনতি আদিবাসী যাতে মুক্তি লাভ করতে পারি এই আশায়, এই কামনা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার।

মিঃ সুকৃতি রঞ্জন চাকমা, মুখ্য নিবার্হী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

ধন্যবাদ। আজকের এই Land Rights Issue নিয়ে চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস-এর বিশেষ কর্মশালার সম্মানিত উদ্বোধক শ্রী গৌতম দেওয়ান এবং সম্মানিত আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী গৌতম কুমার চাকমা এবং Royal Danish Embassy-এর Human Rights and Good Governance নিয়ে যিনি কাজ করেন জনাব সুমন, পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য উষাহ্লা রোয়াজা এবং আজকে আগত বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ।

আসলে land বা ভূমি জিনিসটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশেই একটি জটিল বিষয়। আমি যখন সমতলে চাকুরীতে ছিলাম তখন দেখেছি সত্তর থেকে আশি ভাগ সমস্যাই হলো ভূমিকে নিয়ে। যত রকমের ফৌজদারী মামলা, দেওয়ানী মামলা তো আছেই, যত সমস্যা হলো ভূমিকে নিয়ে। ভূমিকে নিয়ে সমস্যা হওয়ার বিভিন্ন কারণও আছে। আমাদের এখানে যে ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন যেটা বৃটিশরা সারা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেছে সেটাতে কিন্তু ধারাবাহিকতা ছিল না। আইনগুলোর প্রণয়নে অনেকটা ধারাবাহিকতা (Chronology) ছিল না। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এখানে আরেকটা কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশে ১৮৭৫ সালের যে সার্ভে আইন, সেখানে অনেক কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। এই সার্ভে আইনের অধীনে হলো ১৯৩৫ সালের Settlement Manual সেটাতে কিছুটা Lacking রয়ে গেছে। বিশেষ করে সেখানে সার্ভে কর্মকর্তাদের একটা বিধি আছে, যেখানে তাদেরকে একেবারে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ পর্যন্ত এই আইনগত অসংগতিগুলো দূরীভূত করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের এখানে তো আরও ঝামেলাপূর্ণ। একারণে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্যটা একারণে যে, এখানকার প্রসাশনিক ব্যবস্থা আলাদা, ভূমি ব্যবস্থাপনা আলাদা। ইংরেজরা এখানে আসছে সেই ১৭৫৭তে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় পৌনে দু'দুবছর রাজত্ব করে গেছে, কিন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের একসময় যে সরাসরি শাসন সেটা হলো মাত্র সাতাশি বছর, ১৮৬০ থেকে ১৯৪৭। এই জিনিসটা বুঝতে হবে।

আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষে তাদের যে ভূমি ব্যবস্থাপনা তার মূল ভিত্তি হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেটা লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তন করেছিলেন ১৭৯৩ সালে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমির মালিক হবেন জমিদাররা, চিরস্থায়ীভাবে জমি তাদের দেয়া হলো। সরকার শুধু তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ খাজনা বছরান্তে পেয়েই খুশী ছিলেন। এর বাইরে সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। আর জমিদারদের দায়িত্ব ছিল- তারা প্রজা পত্তন করতে পারতেন আর প্রজা উচ্ছেদও করতে পারতেন। তাহলে প্রজাদের স্বত্বটা কি? প্রজাদের কোন স্বত্বই ছিল না। অনেকটা ভূমিদাসের মত জমিদারদের খেয়াল খুশীমত তাদের চাষবাস করতে হতো এবং নির্ধারিত পরিমাণ খাজনা দিতে হতো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এই জমিদারী ব্যবস্থা ছিল না এবং তা প্রবর্তনও করা হয়নি। বৃটিশ সরকার এটা প্রবর্তনও করে নাই।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট পরবর্তীতে যেটা করেছে Revenue Administration যা অনেকটা ভারতের Managerial সরকারের মত। ট্রাডিশনাল লীডারশিপের সাথে সরকারী প্রতিনিধির সমন্বয়ে এখানে বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা চলে আসছে। এখনও পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হেডম্যান, কার্বারী, সার্কেল চীফরাই মুখ্য ভূমিকা রাখেন। এটা কিন্তু বৃটিশদের একটা legacy যা এখনও চলে আসছে এবং সেই ধারাটাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে এবং ১৯০০ সালের রেগুলেশনেও এটা সুস্পষ্ট। ভূমি ব্যবস্থাপনা কি হবে, কারা করবে এর বিধিবিধানগুলো আছে। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, বৃটিশদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা রাজস্ব ব্যবস্থার যে দুটো ধারা তা পার্বত্য এলাকায় একরকম আর সমতলে আরেক রকম। এটা আমাদের বুঝতে হবে । আমরা বুঝি না, আমরা অনেক সময় চাপিয়ে দিতে চাই। যেমন এই যে খাস জমি নিয়ে এখানে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। বিশেষ করে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টসে এই খাস জমি নিয়ে একটা বিতর্ক রয়ে গেছে ।

আমরা যদি "খাস" জমির ব্যাপারটি দেখতে যাই, তাহলে ১৯০০ সালের রেগুলেশন বা তারও আগে বৃটিশ প্রবর্তিত আইনগুলোতে যেতে হবে। কারণ বৃটিশরা এখানে আসে ১৮৬০ সালে এবং এটাকে নতুন জেলা ঘোষণা করে। ভারত উপমহাদেশে প্রথম জেলা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু কোম্পানী গভর্ণমেন্ট। বৃটিশ প্রশাসনকেও আমরা দু'ভাবে ভাগ করতে পারি এই উপমহাদেশে। একটা হলো কোম্পানীর সরাসরি শাসন, যেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী করেছে। ১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ পর্যন্ত হলো কোম্পানীর শাসন। একটা বানিজ্যিক কোম্পানী ব্যবসা করতে এসেছে তারা আবার দেশ শাসনও করেছে। তারা বিলাতের পার্লামেন্ট থেকে রানীর সনদ নিয়ে ব্যবসা করতে এসেছিল। তাদের প্রশাসনটা চলেছিল ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের আগ পর্যন্ত। এই সিপাহী বিদ্রোহের পর কিন্তু তাদের সেই শাসন ব্যবস্থা সরাসরি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে চলে যায়।

তারা বলল যে, একটা ব্যবসায়িক কোম্পানি এত বড় একটা দেশ শাসন করতে পারে না। সুতরাং এটা বৃটিশ পার্লামেন্টের বা বৃটিশ সরকারের হাতে সরাসরি নিয়ে আসতে হবে। সেটা করার জন্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রথম যে আইনটি প্রণীত হলো, সেটি হলো Government of India Act (1858) অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর পরেই। এই আইন বলেই অর্থাৎ ভারত শাসন আইনের অধীনে বৃটিশ সরকার কোম্পানীকে বিলুপ্ত করে দেয় এবং শাসনব্যবস্থা সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয়।

বৃটিশরা এই যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো নিলো এদের মধ্যে একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটা হলো ১৮৩৬ সালের জেলা আইন। এই আইন বলেই এদেশে কিন্তু জেলাগুলো প্রথম সৃষ্টি করেছিলো বৃটিশরা। সেটা কোম্পানী করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৬ সালের জেলা আইন দ্বারা ভারতের জেলাগুলো সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৮ সালে ক্ষমতা নেওয়ার পর বৃটিশ সরকার ১৮৬০ সালে আবার নতুন একটা জেলা আইন করলো। সেটি হলো District Act-1860। এই আইনের অধীনে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বড় বড় জেলাগুলোকে ভেঙে সারা ভারত বর্ষে ৫ শতের অধিক নতুন জেলা সৃষ্টি করলো। District Act-1860 বলে আমাদের চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টসও জেলা হয়ে গেলো অন্যান্য জেলাগুলোর মত।

জেলা হওয়ার পরে দেখা গেলো যে, বিশেষ করে পশ্চাৎপদ যে অঞ্চলগুলো আছে তা ভূগৌলিক দিক দিয়ে হোক, লেখাপড়ায় হোক, শিক্ষা-দীক্ষায় হোক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হোক যেগুলো উপজাতি অঞ্চল বা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সেগুলো এতোই পশ্চাৎপদ যে, তাদেরকে সরাসরি ব্রিটিশ আইন দ্বারা অর্থাৎ সমতলে প্রযোজ্য যে আইনগুলো রয়েছে সেই আইনগুলো দ্বারা পরিচালনা করা যাবে না। তারা এতো পিছনে পড়েছে যে, তাদেরকে আলাদা করে দিতেই হবে। সেটার জন্য তারা আবার একটা আইন করলো, সেটা হলো Government of India Act-1870 (Backward Caste Administration for Backward Tracts)।

পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোর জন্য কিভাবে এ্যাডমিনিট্রেশন হবে, কিভাবে প্রশাসন চালানো হবে সেটার জন্য তারা আবার একটা আইন করলো ১৮৭০ সালে। এর ফলই হলো ১৮৭৪ সালের "Schedule District Act" বা তফশিলভূক্ত জেলা আইন। আজকের চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস্, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এভাবে সারা ভারত বর্ষে প্রায় চৌত্রিশটি অঞ্চল; আন্দামান, নিকোবরও একসময় ছিল, লাক্ষাদ্বীপ, এদিকে কাশ্মীরের বেশ কিছু অঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্তানের আজকে যে ডেরাগাজী খাঁ বলেন এগুলোও কিন্তু একসময় Excluded Area ছিল। এভাবে প্রায় পঁয়ত্রিশটির বেশী অঞ্চলকে তারা district বা জেলা করলো। জেলা করার উদ্দেশ্য হলো একটাই; সেটা হলো এই যে, তাদের যে ethnicity, culture এবং land rights এটাকে protection দেওয়া এবং protection দিতে গিয়ে তাদের সেখানে একটা simple administration চালু করা। সে simple administration হবে traditional leader-দের সাথে মিলে বৃটিশ প্রশাসনের একটা যৌথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এবং সে

যৌথ ব্যবস্থা আমাদের CHT Regulation-এও আছে। সেখানে বলা আছে, বিশেষ করে আমার যদি ভুল না হয়, বিধি-৩৯-এ বলা আছে, বছরান্তে দু'বার সার্কেল চীফের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারকে বসতে হবে এবং বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখানকার প্রশাসন এবং এখানকার অন্যান্য ব্যবস্থাগুলো নিয়ে। এটা CHT Regulation-এর বিধিতে আছে। এখন এগুলো কতটুকু কার্যকর আমি ঠিক জানি না।

আমি আমাদের "খাস" জমিগুলো নিয়ে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। "খাস" শব্দটার অর্থ হলো আসলে নিজস্ব বা নিজের বা একেবারে আসল। এই "খাস" জমিটা আসছে কোত্থেকে? এই "খাস" জমিটা এসেছে ১৯৫০ সালের জমিদারি উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইন বলে যে জমি চলে গেলো সে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু জমি জমিদারদের দেয়া হয়। ১৯৫০ সালের জমিদারি উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারগণকে ক্ষতিপুরণ দেওয়ার জন্য বিধান আছে। জমিদারদেরকে ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদত্ত জমিই "খাস" জমি হিসাবে চিহ্নিত। "খাস" জায়গা যেটা সেটা হলো জমিদারদের নিজস্ব জায়গা, তারা নিজেরাই এখানে যা উচিৎ তাই করতে পারতেন।

আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমিদারই ছিল না সেখানে "খাস" কোত্থেকে পেলেন গভর্ণমেন্ট? এই "খাস" জায়গাটা পেলেন কোত্থেকে? তৎকালীন East Bengal Government, তখনো East Pakistan হয়নি, জমিদারদের কাছ থেকে খাস জমিগুলো ক্ষতিপুরণ দিয়ে নিলেন এবং সেটাকে বললেন যে, ১ নম্বর খতিয়ানে বসাতে হবে। তাহলে এখানে জমিদারই ছিল না বা জমিদারী প্রথা প্রবর্তনই হয়নি তাহলে এখানে খাস জমি থাকবে কোথায়? তাহলে তারা সেখানে "খাস"টা পেলেন কোথায়? "খাস"টা রইল কোথায়? তাছাড়া "East Bengal State Acquisation Tenancy Act"এ প্রথমেই বলা আছে যে, এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এটা নিয়ে এখানে অনেক controversy আছে, অনেক বক্তব্য আছে।

তারপর আরেকটা মজার ঘটনা এই যে, "খাস" বলে কোন শব্দ আমাদের CHT Regulation-এ ছিল না। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত "খাস" বলে কোন শব্দ আপনি CHT Regulation-এ পাবেন না। এটা পরবর্তীতে ঢুকানো হয়েছে । আপনারা জানেন, ১৮ বিধিতে বলা আছে কি কি করতে পারবে এই আইন বলে। ১৮ নম্বর ধারাতে বলা আছে 'To regulate and restrict the transfer of land in the CHT''। সেখানে কিন্তু কোথাও "খাস" শব্দটি বলা নাই। যাহোক সবাইকে ধন্যবাদ।

উদ্বোধনী ভাষণ ঃ গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন

মঞ্চে উপস্থিত আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য শ্রী গৌতম কুমার চাকমা, জেলা পরিষদের সদস্য বাবু উষাতন রোয়াজা, আঞ্চলিক পরিষদের কর্মকর্তা সুকৃতি বাবু, ড্যানিশ এ্যামবেসীর কর্মকর্তা সুমন সাহেব, তিন পার্বত্য জেলা থেকে আগত বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। আমরা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছি- আমরা দু'দিনব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মশালা শুরু করতে যাচ্ছি।

আমরা সবাই, হতে পারে আমার সাথে কারোর কোন দ্বিমত থাকবে না - সমস্যা সংকুল পরিবেশে আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদের ভূমি। ভূমি সমস্যা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, সারা দেশেরই সমস্যা। তবে আমাদের সমস্যাটা একটু, আমি বলবো আরও একটু ভিন্নতর। কারণ আমাদের এই ভূমি সমস্যা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত। এটা আমাদের ব্যক্তিগত কোন চাওয়া পাওয়ার বিষয় নয়, ব্যক্তিগত হারানোর ব্যাপার নয়, এতে জাতিগতভাবে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন রয়েছে ভূমি সমস্যাটা নিয়ে। সেজন্য এখানকার কিছু এনজিও আপনারা প্রোগ্রামে পেয়েছেন আমরা এ সমস্যাটা কিভাবে চিহ্নিত করা যায়, কিছু মৌলিক সমস্যা আছে সেগুলো

কিভাবে চিহ্নিত করা যায়, এটাকে সমাধান করার জন্য আমরা কিভাবে কর্মসূচী নিতে পারি এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য দু'দিন ব্যাপী এই কর্মশালার আয়োজন করেছি।

এখানে সুকৃতি বাবু, আঞ্চলিক পরিষদের কর্মকর্তা কিছুক্ষণ আগে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি এমন কিছু স্পর্শকাতর বিষয় আমাদের বলেছেন যেটা হয়ত আমাদের অনেকের জানা ছিল না। আমাদের এসব বিষয়গুলো জানা দরকার। অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, উনি বলেছেন আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনা ভিন্নতর সমতল অঞ্চল থেকে। এখানে যারা হেডম্যান আছেন, কার্বারী আছেন traditional leader-রা আছেন তারা ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, এই ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে যারা জড়িত, যারা keymen তারা অনেকেই কিন্তু আমাদের আইন সম্বন্ধে, তাদের অধিকার সম্বন্ধে অবগত নয়। এ কারণে আমরা Hill Tracts Manual-এর কথা বলি, ভূমি অধিকারের কথা বলি। কিন্তু যারা ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তাদেরই অনেকের কিন্তু ভূমি সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা নেই।

আপনারা পেপার পেয়েছেন নিশ্চয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে আমরা আমাদের সংগঠন তার পাশাপাশি আরও কয়েকটা সংগঠন মিলে ইতিপুর্বেও কিন্তু বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করেছি। এখানে যারা হেডম্যান রয়েছেন, traditional leader তাদেরসহ টংগ্যার পক্ষ থেকে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস এতে তাদের অনেক জ্ঞান সমৃদ্ধি হয়েছে এবং আমাদের কাজে লেগেছে।

আজকে এখানে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার কোন সুযোগ নেই, আমাদের নির্ধারিত প্রোগ্রাম থেকে আমরা খানিকটা পিছিয়ে আছি। আমরা শুরু করতে চাই এবং আজকে আমাদের এখানে যে সমস্ত পেপারগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে বা হবে যেমন- পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিষয়ক ভূমি সম্পর্কীয় বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে ভূমি বিরোধ বিষয়ে আমাদের শ্রী গৌতম কুমার চাকমা পেপার উপস্থাপন করবেন। আবার রাজা দেবাশীষ রায়ের লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার এখানে উপস্থাপন করা হবে। তারপর আমাদের বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষন আন্দোলনের পক্ষ থেকে সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা মৌজা বন ও সংরক্ষিত বন সম্পর্কে পেপার উপস্থাপন করবেন। জুম্ম শরনার্থী এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু প্রসংগসহ চারটি বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হবে। এগুলি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় আমাদের জন্য।

আমি আশা করবো, আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তারা যথার্থভাবে তাদের সমাজের, তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এই দু'দিনের কর্মশালার মধ্যে দিয়ে আমরা যা শিখবো যা বুঝতে পারবো এবং চিহ্নিত করতে পারবো এবং চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে পারবো ও পরবর্তীতে আরও আরও এগিয়ে যেতে পারবো।

আমি বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শেষ করছি এবং পাশাপাশি আজকের দু'দিনব্যাপী কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে ভূমি বিরোধ

গৌতম কুমার চাকমা[১]

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট আয়তন ৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল বা ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আর বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বকোণে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০৮৯ বর্গমাইল বা ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। এ আয়তন দেশের মোট আয়তনের মাত্র ৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। তন্মধ্যে ২০০১ সালের আদম শুমারীর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ টি পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার এ হিসাব সঠিক হতে পারে না। অনুমান করা হয় যে ২০০৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ হতে পারে।

সারাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ০.২২ একর। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাথা পিছু চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.১৪ একর। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৩.১% জমি তথা ১২৪,১৬০ একর জমি সব ধরনের চাষের উপযোগী। কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্যান চাষের উপযোগী ভূমির পরিমাণ ১৮,৭% বা ৭৫৫,৮৪০ একর এবং ৫.৩% বা২১৪,৪০০ একর পানি ও বসতি এলাকা। অবশিষ্ট ৭২.৯% বা ২৯৪৩,৩৬০ একর ভূমি খাড়া পাহাড় ও পর্বত বিধায় কেবল বন করার উপযোগী।

দেশের সাধারণ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির শ্রেণী বিভাগ ও মালিকানাস্বত্ব বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এ মতভিন্নতা আরো বেশী পরিমাণে প্রকট হয়েছে সরকারী পরিকল্পনাধীনে ১৯৭৯-১৯৮৫ সালে দেশের অপরাপর অঞ্চল হতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ সমতলবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি জবরদখল করে বসতি প্রদানের প্রেক্ষিতে। আরো উল্লেখ্য যে, ভূমি সমস্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হলেও সমতলবাসীদের রাজনৈতিক অভিবাসন ও জমি জবর খল অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান ভূমি সম্পর্কিত পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগত রাজনৈতিক অভিবাসীদের মধ্যেকার বিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ ভূমি সমস্যা সমাধান তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান বিষয়ে বর্তমানে বিশেষ এক সন্ধিক্ষণ চলছে।

২। ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি

১৫৫০ সালে পর্তুগীজ মানচিত্রকর Joa De Barros এর আকাঁ মানচিত্রে CHACOMA বা চাকমা রাজ্যের অবস্থান বা সীমানা দেখানো হয়েছে উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাম্রে বা নাফ নদী, পূর্বে লুসাই হিলস এবং পশ্চিমে সমুদ্র। পরবর্তীকালে ১৭৬৩ সালে (১১৭০ মঘী সনের ৬ই শ্রাবণ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রথম প্রধান কর্মকর্তা Mr. Henry Verelst কর্তৃক চাকমা রাজার শাসনাধীন রাজ্যের সীমানা বর্ণিত হয়েছে যে "The local jurisdiction of Chakma Raja

---

[১] গৌতম কুমার চাকমা ঃ আহ্বায়ক, আইন, ভূমি ও স্থানীয় পরিষদ বিষয়ক কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।

Shermust Khan is to be all the hills from Pheni river to the Sangu and fron Nizampur road to the hills of Kuki Raja."

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ সালে ভারতে আগমন করে। ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাবকে পরাজিত করে রাজ্য জয়ের সূচনা করে। আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে বিভিন্ন রাজ্য জয়ের মাধ্যমে কালক্রমে বেনিয়া থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী অধিকৃত রাজ্যসমূহে কোম্পানীর শোষন-শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। ব্রিটিশ সরকার ১৭৭২ সালে পার্লামেন্টে "রেগুলেটিং এ্যাক্ট-১৭৭২" পাশ করে ভারতের উক্ত রাজ্যসমূহের শাসনভার গ্রহণ করে।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে 'কার্পাস মহল' বা 'চাঁদিগাং রাজ্য' চাকমা রাজার শাসনাধীন ছিল। ১৭৮৭ সালে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তা ব্রিটিশ ভারতের করদ বাজ্যে পরিণত হয়। উক্ত চুক্তির মূল বিষয়াদি ছিল নিম্নরূপঃ

1) The East India Company recognised Jan Bakhsh Khan as the Raja of the Chakmas.

2) It was agreed that the collection of revenue was the responsibility of Raja.

3) The British government would preserve tribal autonomy and migration from the plains would be restricted.

4) Jan Bakhsh Khan was bound by the treaty to maintain peace in his country.

5) British troops would remain in the Chakma territory not to terrify the Chakmas but to protect the land from the inroads of the fierce tribes."

ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা" প্রবর্তন করেন। তিনি প্রথমে বাংলা, বিহার ও উড়িশ্যায় তা কার্যকর করেন। এ ব্যবস্থাধীনে ভূমির উপর গ্রামবাসীদের যৌথ মালিকানা প্রথার অবসান হয়। গড়ে উঠে ব্যক্তি মালিকানাস্বত্ব।

১৮৫৮ সালে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে বিদ্রোহ হয়। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানী শাসনের পুরোপুরি অবসান ঘটিয়ে সমগ্র ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। অতঃপর শাসন সংস্কার শুরু করে। ১৮৬০ সালে "জেলা আইন-১৮৬০" প্রণয়ন করে সারা ভারতকে শত শত জেলায় বিভক্ত করে।

উক্ত জেলা আইন অনুসরণে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার চাঁদিগাং বা চট্টগ্রামকে (ইংরেজীতে Chittagong) দু'ভাগে বিভক্ত করে। সমতল অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকা 'চট্টগ্রাম জেলা' বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূক্ত করে। পাহাড়ী এলাকা নিয়ে গঠিত 'চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল' বা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা' ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে রাখা হয়।

১৮৬১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে "ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১"(Indian Council Act 1861) পাশ হয়। ১৮৭০ সালে "ভারত শাসন আইন ১৮৭০" বা Government of India Act (for Adinistration of the Backward Tracts), 1870 ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়। এ সব আইনে ব্রিটিশ ভারত সরকারকে বিশেষ অঞ্চল শাসনের জন্য বিধি তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল বহু বিধান প্রবর্তন করেন।

ব্রিটিশ ভারত সরকার উপলব্দি করে যে "জেলা আইন ১৮৬০" অনুসরণে পশ্চাদপদ আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাসমূহ চলতে পারছে না। অতঃপর ১৮৭৪ সালে ভারতীয় আইনসভা "তফসিলভূক্ত জেলা আইন ১৮৭৪" (Scheduled Districts Act, XIV of 1874) পাস করে। এ আইন বলে বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট করে একটি তালিকা করা হয়। উক্ত তফসিলভূক্ত জেলা আইন এর আওতায় অপরাপর বিভিন্ন জেলার সাথে পশ্চাদপদ ও সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি তফসিলভূক্ত জেলায় পরিণত করা হয়।

মূলত: ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১, ভারত শাসন আইন ১৮৭০ ও তফলিভূক্ত জেলা আইন ১৮৭৪ এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সর্বপ্রথম Rules for the Territorial Circle in the CHT 1884 প্রবর্তন করে। এ Rules বলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা, বোমাং, মং ও সংরক্ষিত বনায়ন সার্কেল হিসেবে বিভক্ত করা হয়। ২ বর্গ মাইলের কম নয় ও ১০ বর্গ মাইলের বেশি নয় এমন এলাকা নিয়ে মৌজা গঠন করা হয় এবং খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১৯০০ সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার "The CHT Regulation 1900" (1 of 1900) প্রণয়ন করে। এ শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, ভূমি ও রাজস্ব এবং বিচারকের ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক ছিলেন বাংলার গভর্ণরের প্রতিনিধি আর গভর্ণর ছিলেন ব্রিটিশ ভাতের গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি। এক কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে শাসিত হয়। তা কখনো বাংলার শাসনাধীনে ছিল না। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন, বিচার ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাংলার ব্যবস্থাদি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সার্কেল চীফ ও হেডম্যানদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। তাছাড়া সমতল অঞ্চলে প্রচলিত কোন কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রযোজ্য হবে, কোন কোন আইন মোটেই প্রযোজ্য হবে না এবং কোন কোন আইন কি পরিমাণে বা কতটুকু প্রযোজ্য হবে ইত্যাদি মর্মে একটি লম্বা তফসিলও উক্ত রেগুলেশনে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালে ভারতের জন্য প্রথম একদফা বড় ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে- "আদিবাসী সমাজে এমন কোন উপাদান নেই যার উপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান যেতে পারে।" তাই আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে ইতোপূর্বেকার "বিশেষ শাসনব্যবস্থার নীতি" পূর্ববৎ বহাল রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৯ সালে "ভারত শাসন আইন ১৯১৯" প্রবর্তন করা হয়। উক্ত আইন বলে তফসিলভূক্ত জেলা আইনে উল্লেখিত অঞ্চলের তালিকা পুনর্বিবেচনা করে একটা নতুন তালিকা তৈরি হয়। এর নাম দেয়া হয় অনগ্রসর অঞ্চল (Backward Tracts) এর তালিকা। এ অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকায় ২নং ক্রমিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম ছিল। তালিকাটি ছিল নিম্নরূপঃ-

১) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম ৩) স্পিতি ৪) দার্জিলিং জেলা ৫) লাহোল ৭) গাঞ্জাম এজেন্সি ৮) ভিজাগা পট্টম এজেন্সি ৯) গোদাবরী এজেন্সি ১০) ছোট নাগপুর বিভাগ ১১) সম্বলপুর জেলা ১২) সাওতাল পরগানা জেলা ১৩) গারো পাহাড় জেলা ১৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা বাদে) ১৫) মিকির পাহাড় ১৬) উত্তর কাছার পাহাড় ১৭) নাগা পাহাড় ১৮) লুসাই পাহাড় ১৯) সঁদিয়া বলিপাড়া ও লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল।

সারা ভারতে আরেক দফা বড় ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হয় ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতীয়দের স্বাধীনতার আন্দোলন ও দাবী অধিকতর জোরদার হওয়ার প্রেক্ষিতে "ভারত শাসন আইন ১৯৩৫" প্রবর্তন করা হয়। এ আইনেও অপরাপর অঞ্চলের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "শাসন বহির্ভূত এলাকা" (Excluded Area) হিসেবে রাখা হয়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭" পাশ হয়। উক্ত আইন অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়। এ আইনে আদিবাসীদের শাসন বহির্ভূত এলাকাসমূহের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার বিধান ছিল। তদনুসারে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" ও "পৃথক শাসিত অঞ্চল" বা "উপজাতীয় অঞ্চল" এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রে পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা দেশের সমতল অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা হতে সম্পূরূপে পৃথক। মূল পার্থক্যগুলো নিম্নরূপঃ

এক. দেশের সাধারণ আইন "ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ১৯৯০" অনুসারে সরকার ভূমির মালিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সাল" অনুযায়ী সরকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserve Forest) এর মালিক। মৌজাধীন সকল ভূমির যৌথ মালিকানাস্বত্ব মৌজাবাসীর।

দুই. দেশের সাধারনণআইন "ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ১৯৯০" অনুসারে ব্যক্তি মালিকানাধীনে বন্দোবস্তকৃত ভূমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারী ভূমি ব্যবহার অবৈধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সাল" অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীনে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যায়। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ব্যতীত মৌজাধীন অন্যান্য ভূমিতে বসবাস ও চাষাবাদ মৌজাবাসীর জন্য বৈধ অধিকার।

তিন. দেশের অপরাপর অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া আলাদা। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান- সার্কেল চীফ ও হেডম্যানগণ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত। দেশের সাধারণ আইনে বা ব্যবস্থাপনায় তা নেই।

৩। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি

"পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০"-এর ৩৪ নম্বর বিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমি হস্তান্তর করার বিধান ছিল। এ উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতিরেকে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। তা' ছাড়া 'Bazar Fund Rules 1937' অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীদের জন্য হাট-বাজার এলাকায় স্বল্প মেয়াদে ভূমি ইজারা দেবার বিধান ছিল।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৩৪ নম্বর বিধি সংশোধন করে অস্থানীয় অ-পাহাড়ীদের/সমতলবাসী বাঙালীদের ব্যাপকহারে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে। সরকার ১৯৭৯-১৯৮৫ সালে সরকারী পরিকল্পনাধীনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ সমতলবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করে। সেনাবহিনী ও সেটেলাররা গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও নানা অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে এবং ভূমি জবরদখল করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা তথাকথিত সমাধানের নামে সরকার পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। উক্ত ব্যবস্থাধীনে প্রণীত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে ভূমি বন্দোবস্ত বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন পদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা হয়। এ বিধান কার্যকরকরণার্থে ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৮৯ সালের ১৯শে জুলাই এক প্রজ্ঞাপন (ঢাকা, ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৯৬/১৯শে জুলাই ১৯৮৯ নং ভূঃ ম:/ শা-৯/১৬/৮৯-৫৮১) জারী করে।

সরকার ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি রহিত করার জন্য সরকার অন্য একটি আইন "পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন ১৯৮৯" প্রণয়ন করে। উক্ত আইন কার্যকর করা হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বিবেচনায় তা বার্যকর করা থেকে বিরত থাকে এবং সরকারের বিশেষ কার্যাদি মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সাল কার্যকারিতার নির্দেশনা (বিকা (কল্যাণ)ম-৭(৯)/৯০(প্রঃ)/২৭, তারিখ ২৯/১০/৯০) প্রদান করে। তদপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকরা ভূমি পূর্বানুমোদন সংক্রান্ত পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা অস্বীকার করে।

অতঃপর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এ আইনে পূর্বেকার পূর্বানুমোদন পদ্ধতি এবং জেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' অন্তর্ভূক্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বা অন্য কোন আইনের অসংগতি থাকলে উক্ত আইনসমূহ সংশোধনের বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন করে নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সামরিক উপায়ে সমাধানের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে সরকারী পরিকল্পনাধীনে ১৯৭৯-৮৫ সালে ৫ (পাঁচ) লক্ষ সমতলবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। সামরিকবাহিনী ও সমতলবাসী সেটেলাররা গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি অতঅচার-নির্যাতনের মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে। তাদের নামে রেকর্ডভূক্ত ও দখলাধীন জায়গা-জমি সেটেলাররা জবরদখল করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। উক্ত ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়।

২০০১ সালে সরকার "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণয়ন করে। উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভূক্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সে সব ধারা সংশোধনের সুপারিশমালা পেশ করে। আইন মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক পরিষদের সাথে বৈঠক করে সমঝোতায় উপনীত হয় এবং ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে ভেটিং প্রদান করে মন্ত্রী পরিষদে প্রেরণ করে। উক্ত আইনের সংশোধন সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি দলের সাথে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২০০৪ সালের ২১ মে এপ্রিল তারিখে আলোচনা উত্থাপিত হয়। কিন্তু আলোচনা সমাপ্ত হয় নি। উল্লেখ্য, সরকার উক্ত আইন সংশোধনের সদিচ্ছা পোষণ করলে খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে ভূমি কমিশনের সংশোধন আইন পাশ করে নিতে পারে। কিন্তু সরকার তা করার সম্ভাবনা আপাতত নেই বললেই চলে।

১৯৯৯ সালে ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান নিয়োগ করে। ভূমি কমিশন আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত কমিশন চেয়ারম্যান কাজ করতে পারবে না। ভূমি কমিশন কার্যকর না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। অথচ ইসলামিক সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ও সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায় সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও জমি জবরদখল অব্যাহত রয়েছে।

সরকার অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে সরকারী দলের লোক নিয়োগ করেছে। তাদের উপর সরকারী দলের অস্থানীয় সমতলবাসী নেতা ও সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের প্রচন্ড চাপ অব্যাহত রেখে সেটেলারদের অনুকুলে ভূমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কার্যকরকরণের প্রচেষ্টা রয়েছে। পার্বত্য জেলার কোন কোন উপজেলা পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তা ও জেলা

প্রশাসক অস্থানীয় ও সমতলবাসী হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে সমতলবাসী সেটেলারদের অনুকুলে ভূমি হস্তান্তরের কাজ করে থাকে।

অপরপক্ষে বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কোন ভূমি কোন সেটেলার জবরদখল করলে তার কোন বিচারই আদালত হাতে নেয় না বা নিস্পত্তি করে না। বৈধ রেকর্ডভূক্ত ভূমির বিষয়ে কোন মামলা আদালতে করা হলে তা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে। সর্বনিম্ন উপজেলা আদালত হতে ক্রমান্বয়ে জেলা আদালত, বিভাগের সেসন আদালত এবং সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে পৌঁছে। কোন আদালত ভূমির প্রকৃত মালিকের অনুকুলে রায় দিলে ভূমি জবর দখলদারকে উচ্ছেদের জন্য পুনরায় উপজেলা আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়। উক্ত উচ্ছেদ মামলা নতুন করে নিম্নতর আদালত হতে উর্ধতম আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এ ধরনের মামলা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হয়ে থাকে। তাই জুম্মদের পক্ষে মামলা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম ও বাঙালী সেটেলারদের মধ্যে মূল সংঘাত হলো ভূমি নিয়ে। এ সংঘাতে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গভাবে জুম্মদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। যে কোন অজুহাতে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ জুম্মদেরকে অত্যাচার-নিপীড়ন করে, মামলায় জড়িয়ে, সেটেলারদের দিয়ে ফসল বা ফলমূল জোর করে কেড়ে নিয়ে জুম্মদেরকে উৎখাত করার ও ভূমি কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পূর্বানুমোদন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অব্যাহতভাবে সরকারের নিকট দাবী তুলে ধরে। পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ হতেও এ বিষয়ে সরকারের নিকট জোরালো দাবী রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকগণ বর্তমানে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন গ্রহণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করেছে।

বাজার ফান্ড এলাকায় প্রশাসক হিসেবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ভূমি লীজ বা হস্তান্তর করে থাকেন। তবে এ বিষয়ে অনিয়ম বিদ্যমান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র ২৩/১০-/২০০১ তারিখ ও স্মারক পাচবিম প-১) পাঃ জেলা/ বিবিধ/৮৫/২০০০/২৮০ অনুসারে পার্বত্য জেলায় খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান বন্ধ রয়েছে।

তবে ১০/০৫/২০০৩ তারিখে পাচবিম উপমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার ৬ (খ) নং সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত স্থগিতাদেশ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে case to case পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিচার-বিশ্লেষণ করে শিথিল করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

গ. শ্মশান, কবরস্থান

ঘ. বাণিজ্যিক কারণে বাজার ফান্ডের জমি কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রদান

ঙ. সরকারের কোন দপ্তরের জরুরী প্রয়োজনে।

জেলা প্রশাসকরা উক্ত ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিধান নেই বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে নতুন বিধি সংযোজনের প্রস্তাব দিয়েছেন। আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ তাতে অসম্মতি জানিয়েছে। পরিবর্তে পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে "ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা" হস্তান্তর করতে মতামত দিয়েছে।

উক্ত বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদ আরো জানিয়েছে যে বর্তমানে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন। সুতরাং পার্বত্য জেলার ভূমি পার্বত্য জেলা পরিষদের বৈধ মালিকানাধীন। সরকারী বা বেসরকারীর সংস্থার নামে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করে রেকর্ডভূক্ত করতে হলে পার্বত্য জেলা পরিষদকে মূল্য/দাম দিতে হবে। আর বাজার ফান্ড এলাকাধীন ভূমি কেবল ইজারা দেওয়া যাবে নির্ধারিত আইন ও মূল্য নিয়ে।

ভূমি বিরোধের প্রকার

জুম্ম ও সেটেলারদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভূমি বিরোধ রয়েছে। যেমন-

- জুম্মদের রেকর্ডভূক্ত ও ব্যবহৃত ভুমি বেদখল
- জুম্মদের দখলাধীন ও বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়াধীন ভূমি বেদখল
- জুম্মদের দখলাধীন ভূমি বেদখল
- জুম্মদের রেকর্ডভূক্ত ও অব্যবহৃত ভুমি বেদখল
- জুম্মদের রেকর্ডভূক্ত ও ব্যবহৃত ভূমি বেদখল এবং জাল দলিল তৈরী
- জুম্মদের দখলাধীন ও বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়াধীন ভূমি বেদখল এবং দলিল তৈরী
- জুম্মদের দখলাধীন ভূমি বেদখল এবং দলিল তৈরী
- জুম্মদের রেকর্ডভূক্ত ও অব্যবহৃত ভূমি বেদখল এবং জাল দলিল তৈরী
- যৌথ মালিকানাধীন ভূমি/ মৌজার খাস জমি দখল ও বন্দোবস্তী দলিল লাভ
- জুম্মদের রেকর্ডভূক্ত ভূমি জোরপূর্বক ক্রয়মূলে হস্তান্তর দলিল তৈরী
- কোন জুম্ম জমি অন্য জুম্ম হতে ক্রয়মূলে বেদখল ও দলিল তৈরী
- জুম্ম হতে সেটেলার কর্তৃক ক্ষয় বন্ধকাধীন জমি
- জুম্ম হতে সাময়িক কালের জন্য চাষের নামে বেদখলে রাখা জমি।

সমাধানের উপায়

- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও সেটেলারদের মধ্যেকার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" সংশোধন অপরিহার্য। এ আইনের খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত করা আছে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তা জাতীয় সংসদে পাশ করতে পারে।
- সরকারের উদ্যোগ ছাড়াও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমির মালিক সেটেলারদের সমতল অঞ্চলে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।
- জুম্মদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
- জুম্মদেরকে মামলার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
- জুম্মদেরকে বন্ধকী জমি ফেরত লাভের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সমাধান সম্ভাবনা

সরকার "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" সংশোধন করে ভূমি কমিশন কাজ করলে এ ভূমি সমস্যা সমাধান হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমতলবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীতি পরিবর্তন ব্যতীত ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করার ও কমিশনকে কার্যকর করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

পার্বত্য জেলা পরিষদে "ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা" হস্তান্তরের পর ভূমি মালিকানাস্বত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া কার্যকর করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ ভূমি সমস্যা সমাধান হতে পারে।

বেসরকারী উদ্যোগে সেটেলারদেরকে তাদের স্ব স্ব জেলায় বা অন্যত্র পরীক্ষামূলকভাবে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। এতে ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমির মালিক সেটেলাররা সাড়া দিতে পারে বলে আশা করা যায়।

সর্বোপরি বাস্তবতা অনুধাবন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম তথা স্থায়ী অধিবাসী নেতৃবৃন্দকে এ সমস্যা সমাধানে সর্বাগ্রগণ্য মনোযোগ দিতে হবে। এ সমস্যা সমাধানের বাস্তবসম্মত সম্ভাব্য উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। দেশের ও বিশ্বের সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী জুম্মদের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা - শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ও ভূমির অধিকার - রাজা দেবাশীষ রায়
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা - শ্রী গৌতম কুমার চাকমা।

‘পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে ভূমি বিরোধ’ এর গৌতম কুমার চাকমার উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর

প্রশ্নোত্তর পর্ব ও মুক্ত আলোচনা

এই অংশে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ খোলাখুলিভাবে ভূমি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং এগুলোর উত্তর প্রদান করেন যথাক্রমে আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য গৌতম কুমার চাকমা এবং ঐ পরিষদেরই মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুকৃতি রঞ্জন চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের সভাপতি গৌতম দেওয়ান।

সন্তোষিত চাকমা বকুল, সাধারণ সম্পাদক, জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতি প্রশ্ন করেন যে, ক্ষয় বন্ধকের স্থানে স্থিতি বন্ধক হিসেবে লেখা উচিৎ কিনা। প্রত্যুত্তরে সুকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, স্থিতি বন্ধক বেআইনী হয়েছে এবং এর বেনামী transaction-ও নেই।

সন্তোষিত চাকমা বকুল আরো বলেন, বন্ধকের যে নীতি বা যে হারে ক্ষয় হয়ে যায় তাতে গ্রহীতা কখনো টাকা ফেরৎ দিতে পারবে না বলে জমিগুলো সেটেলারদের হাতে চলে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বাবু সুকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে রেজিস্ট্রেশন হলে এটা বেআইনী। বাংলাদেশে সুদ ব্যবসাও বেআইনী।

টুকু তালুকদার প্রশ্ন করেন, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে ভূমি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করতে পারে কিনা?

জবাবে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবিধান প্রণয়ন ও প্রজ্ঞাপণ জারি করতে পারে। বাবু সুকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, বিধি ও প্রবিধান এসব বিষয়সমূহ খোলাসা করা উচিৎ। বিধি সরকারের প্রশাসন উদ্যোগ নেয়। বিধির অধীনে প্রবিধান তা কিন্তু নয়। আমাদের পার্বত্য জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদের আইনগুলোতে বিধি ও প্রবিধান সম্পর্কে বলা আছে। বিধি ও প্রবিধান করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের রয়েছে।

টুকু তালুকদার আরো বলেন, কেন এতদিন ধরে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহ বিধি ও প্রবিধানগুলো কার্যকর করতে পারছে না?

এ সময় রাংলাই ম্রো প্রশ্ন করেন, স্থানীয় সরকার পরিষদ সৃষ্টি হয়েছে ১৯৮৯ সালে। আইনে লেখা আছে যে, লীজ বা হুকুম দখল করা যাবে না। তারপরও বান্দরবান জেলা প্রশাসকের হুকুমে ভূমি দখল দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে কিনা?

গৌতম কুমার চাকমা বলেন, ১৯৯১ সালের পদ্ধতি অনুসরণ না করে যদি হুকুম দখল দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা বাতিলযোগ্য। এর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে এবং ইহা প্রতিকার পাওয়ার যোগ্য।

এরপর সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন বলেন, আমি লাট সম্পত্তি সংক্রান্ত একটু যোগ করবো। এটা হচ্ছে মূলতঃ সাতকানিয়ার পাশাপাশি এলাকা বান্দরবানের ৪৮নং ওয়ার্ডের মধ্যে দুই হাজার সাতশত একর জায়গা রানী ভিক্টোরিয়া আমলে উনারা নিষ্কর জায়গা হিসেবে পেয়েছিলেন। তিন চার বছর পূর্বে বান্দরবানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভূমি ডিপার্টমেন্টের সাথে মামলা করে। যেহেতু প্রার্থী ছিলেন না, এই সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি বীর বাহাদুর বাবু, জেরী বাবু এবং উনাদের দলীয় স্তরের সবাইকে সদস্য করে একটি সমিতি করেন। এই সমিতির মাধ্যমে লাট সম্পত্তিকে উনারা তখন নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। এরপরে ডিসির সহায়তা নিয়েছেন। ডিসি বলেছিলেন যে, সর্বশেষ একটা সুযোগ আছে এবং সেটা হচ্ছে যে, আপনারা

যদি সমিতিকে হস্তান্তর করেন তাহলে এতে আপনারা স্বত্বটা বেশী পেয়ে যাবেন। কিন্তু যে জায়গার মধ্যে বেশ কয়েকটা পরিবার, কয়েকটা ম্রো গ্রাম আছে যারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তারা উচ্ছেদ আশংকায় ভূগছেন প্রত্যেকদিন। এই হচ্ছে বিষয়টা।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রবন্ধ উপস্থাপক সম্মানিত আঞ্চলিক পরিষদ সদস্যের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে, উনি বলছেন যে- ভূমি বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন হয়েছে, আইন হয়েছে তবে সে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। সেটা সংশোধন না করলে ভূমি সমাস্যাটা সমাধান হবে না। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, এটা সংশোধন করলেও ভূমি সমস্যাটা পুরোপুরি সমাধান হবে কিনা?

চুক্তিতে উল্লেখ আছে কোন কোন বিষয় চুক্তির এক্তিয়ারে নাই। এখানে মূলতঃ চুক্তির কারণে ভূমি কমিশন হয়েছে। এটা চুক্তির ফসল। কোন কোন বিষয় চুক্তির এক্তিয়ারে নাই সেটা হচ্ছে সরকারী সম্পত্তি, ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মতন সরকারী সম্পত্তি এবং রিজার্ভ ফরেস্টগুলো। তাহলে '৯৭ সালের চুক্তির পূর্বে যে সমস্ত ভূমি বন বিভাগের মাধ্যমে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ আটার হাজার একর জায়গার মধ্যে অর্ধেকের মতন জায়গার গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেছে, সেগুলোর অবস্থা কি দাঁড়াবে? এই ভূমি কমিশনের আওতায় এগুলো সমাধানের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? কারণ ভূমি কমিশনে সরকারের কোন বিভাগের সাথে স্থানীয় জনগণের ভূমি বিরোধের মীমাংসার কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। এটা আমার একটা প্রশ্ন।

দ্বিতীয়তঃ আমার একটা প্রস্তাব হলো- যেহেতু আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ভূমি কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশমালা পাঠিয়েছেন। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, উনাদের এই দাবীকে আরও জোরালো করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যারা এ সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেন, কি কি সুপারিশ হয়েছে, সরকার আদৌ এগুলোর ব্যাপারে আন্তরিক কিনা, ভূমি কমিশনে কি কি বিষয় আছে এগুলো যদি এই ধরনের ওয়ার্কসপের মাধ্যমে হোক বা সেমিনারের মাধ্যমে হোক ভালভাবে জ্ঞাত করানো যায় তাহলে আমার মনে হয় এখান থেকে একটা শক্তি আসবে। মূলতঃ এটা হলো সংশোধনের জন্য একটা চাপ সৃষ্টি করা। কারণ যে কোন কিছু করতে গেলে যেটা হয়ত দু'এক জনের পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে যদি ব্যাপক সংখ্যক জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়েন, সাপোর্ট দেন তাহলে সেটা একটা শক্তিতে পরিণত হয়। এটাই আমার প্রস্তাব। আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে স্থানীয় জনগণের যে বিরোধ সেটা কিভাবে মীমাংসা করা যেতে পারে?

প্রত্যুত্তরে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি চুক্তিতে কোন কোন জায়গা-জমি কমিশনে অন্তর্ভূক্ত হবে না তার একটা রেফারেন্স দিয়েছেন। আমার মনে হয় বিষয়টা পুরোপুরি সঠিক নয়। ভূমি কমিশনে কোন কোন এলাকা অন্তর্ভূক্ত হবে না এটা কিন্তু চুক্তিতে উল্লেখ নেই। আপনি যেটা বলেছেন সেটা হলো, পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমির পূর্বানুমোদনের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গার জন্যে এই পূর্বানুমোদন লাগবে না তার একটা বিধান আছে ৬৪ নম্বর ধারায়। ঐ ধারায় আছে এভাবে- অন্য কোন আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার অধীন জায়গা জমি বন্দোবস্ত হস্তান্তরের জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন লাগবে; তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল অর্থাৎ যেটা রিজার্ভ ফরেস্ট, (এই সংরক্ষিত বনাঞ্চল টার্মটা কিন্তু একটু বিরোধাত্মক আছে। বন আইন অনুসারে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলতে reserve forest আর পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোতে সংরক্ষিত শব্দের অর্থ হলো protected forest সেজন্য ঐ reserve forest শব্দটা বলতে হয়।) অর্থাৎ এক. এই reserve forest-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; দুই. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; তিন. বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং চার. সরকারের রেকর্ডভূক্ত

জায়গা-জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ সরকারের নামে যেগুলো রেকর্ডভূক্ত আছে এগুলোর ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন হবে না, এগুলো হলো পূর্বানুমোদন সম্পর্কীত বিধান।

কিন্তু পার্বত্য জেলার আওতাধীনে ভূমি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টা যেহেতু পার্বত্য জেলা পরিষদের; সুতরাং বন্দোবস্ত হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় যখন এই আইনটি কার্যকর হবে তখন কাপ্তাই বাঁধের জলেভাসা (fringe land) এলাকার জায়গা জমি বন্দোবস্তী হবে সেখানেও কিন্তু এই জেলা পরিষদই বন্দোবস্তী দেবে। তাহলে দুটো বিষয়, একটা হলো পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়া; আরেকটা হলো অনুমোদনের পর বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়ায় হয়ত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; কিন্তু অনুমোদনের পর বন্দোবস্তী ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আর ভূমি কমিশন আইনের ক্ষেত্রে আছে যে- ভূমি কমিশনের এক্তিয়ার কি হবে। চুক্তিতে আছে, পুনর্বাসিত শরণার্থীসহ অন্যান্য যাদের জায়গা-জমি বেদখল হয়েছে সেসমস্ত বেদখল হওয়া জায়গা-জমির ক্ষেত্রে ভূমি কমিশন বিরোধ নিস্পত্তি করবে। আর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমির ক্ষেত্রে এই কমিশনের এক্তিয়ার কার্যকর হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটা হলো যেখানে যেখানে ভূমি বিরোধ আছে সবক্ষেত্রে এই ভূমি কমিশন কাজ করবে। আর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা যা ১৯৫৮ সালের আইনের প্রেক্ষিতে সরকারের জমি হয়েছে বলে একটা ধারণা আছে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে- এটাও কমিশন আওতায় মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এতে কোন বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আর ২০০১ সালে ভূমি কমিশন আইন প্রণয়নকালে ভূমির পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়ায় যেসব ক্ষেত্রগুলো থাকবে না সে ক্ষেত্রগুলো এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। ভূমি কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে না তা নিয়ে কিন্তু খুব বিবাদ হয় সরকারের সাথে আমাদের। শেষ পর্যন্ত ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসের ২১ তারিখে যখন মিটিং হয় সে মিটিং-এ আমি নিজে একজন প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে clarify করে দেয়া হয়েছে যে, এটা পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমি হস্তান্তরের পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এটার সঙ্গে এই ভূমি কমিশন আইনের কোন সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং সেটা এখানে (ভূমি কমিশন আইনে) আনা অবান্তর। এটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং চুক্তির ধারাগুলো ভালভাবে দেখিয়ে দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, fringe land-এর ক্ষেত্রেও কমিশন বিরোধ নিস্পত্তি করবে এবং যেখানে যেখানে বিরোধ আছে সেগুলো নিয়েই এই ভূমি কমিশন কাজ করবে।

এক্ষেত্রে বন এলাকা যদি অধিগৃহীত হয়ে থাকে, এই নিয়ে যদি সমাস্যা উদ্ভব হয়ে থাকে সেগুলোতে ভূমি কমিশন যেতে পারবে না কিনা তা নিশ্চিত করে আমি জানি না। তবে যেতে পারবে না এটা কিন্তু সেখানে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। সুতরাং এদিক দিয়ে কিন্তু আমি বলতে পারি যে, আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশমালা আইন মন্ত্রণালয় বা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেভাবে গ্রহণ করেছে সেভাবে যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় সংশোধনীটাসহ ভূমি কমিশন আইন আবার সংসদে পুনরুত্থাপিত করে পাশ করা হয় তাহলে আমার মনে হয় সেই অসুবিধাটা থাকবে না।

কিন্তু আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি না যে, সরকার শেষ পর্যন্ত সেটা সংশোধন করবেন কিনা। কারণ প্রথমে সেটা সংসদে উত্থাপিত হবে, সংসদে সংসদ সদস্যরা নানা বক্তব্য তুলে ধরবেন, সংসদ থেকে স্থায়ী কমিটিতে যেতে পারে, স্থায়ী কমিটিতেও নানা সুপারিশ তুলে ধরতে পারে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশমালা অনুসারে ভূমি কমিশন আইন সংশোধিত হবে কিনা তার নিশ্চয়তা দেয়া কঠিন। ধন্যবাদ।

সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা আরো বলেন, জিনিসটা আমার এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না এই কারণে যে, চুক্তির প্রথম দিকে যে যে বিষয়ের উপর চুক্তির ধারাগুলো affect হবে না তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেখানে

সংরক্ষিত বন, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা ইত্যাদি specifically উল্লেখ আছে। এই সূত্র ধরে তারা বলছেন যে, এগুলো যেহেতু চুক্তির পূর্বে সেহেতু এগুলো চুক্তির বাইরে। এই ভূমি নিয়ে মামলা হয়েছে, যেমন রাজেস্থলীতে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার রিরুদ্ধে ৭০টি মামলা হয়েছে, হাইকোর্টেও একটা রিট মামলা হয়েছে। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যেহেতু চুক্তিটি হচ্ছে মূল জিনিস অর্থাৎ এই চুক্তির প্রেক্ষিতে ভূমি কমিশন। ভূমি কমিশন কিন্তু চুক্তিকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে না। সে কারণে আমি বিষয়টা জানতে চাচ্ছি যে, যে রিজার্ভ ফরেস্টগুলো ঘোষিত হয়ে গেছে যেগুলোতে আমাদের বিভিন্ন জনের জমি আছে, হাজার হাজার লোকের জমি আছে সেই জমিগুলো নিস্পত্তির এক্তিয়ার ভূমি কমিশনের আছে কিনা? ধন্যবাদ।

এ প্রসঙ্গে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, এখানে আপনি আসলে দুটো বিষয় বললেন। একটা হলো ভূমি বন্দোবস্ত বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, জায়গা-জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়ায় জেলা পরিষদের কাছ থেকে নিতে পারে। আরেকটা হচ্ছে ভূমি কমিশন আইনের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে।

এখানে যদি আইনটা থাকতো তাহলে পড়ে শোনাতে পারতাম। ভূমি কমিশন আইনে লেখা আছে যে, পুনর্বাসিত শরণার্থীসহ অন্যান্য যে সকল জায়গা-জমির ক্ষেত্রে বিরোধ রয়েছে, (যদিও সেখানে সেটেলার শব্দটির উল্লেখ নাই) সে সমস্ত জায়গা-জমির বিরোধ ভূমি কমিশন নিস্পত্তি করবে। আর সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। ১৯৫৮ সালে অধিগ্রহণ হওয়ার পরে এই নিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের একটা ভিন্নমত আছে; যাতে সেই ভিন্নমতটা এখানে কার্যকর হতে না পারে সেজন্য ঐটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে ভূমি কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে।

সেখানে পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়ায় যেসব ক্ষেত্রগুলো থাকবে না সেসব ক্ষেত্রগুলোর রেফারেন্স দিয়ে ঐ ভূমি কমিশন কাজ করতে পারবে বলে লিখেছে। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, এটা ছিল ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য সম্পৃক্ত, আর ঐটা কেন ভূমি কমিশন আইনের বেলায় আনা হবে। ভূমি কমিশন আইন হওয়ার ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্র কি হবে তা সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে। এটা বলার পরে আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশমালা অনুসারে সরকার সংশোধনী আনতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু এখন আইনটা সংশোধনীর অপেক্ষায় আছে।

এসময় সুকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, বন আইন ১৯২৭ অনুযায়ী চুক্তি হওয়ার আগে বেশ কিছু এলাকা রিজার্ভ ফরেস্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বা ডিক্লেয়ারের একটা পর্যায়ে আছে। কিছু গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে, কিছু হয়নি যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমি যতটুকু জানি, আইনে গেজেট নোটিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত সেটা রিজার্ভ ফরেস্ট হয় না। গেজেট নোটিফিকেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, ধারাটা আমার ঠিক মনে নেই, ৯ কি ১১ হবে। যেমন ২০ ধারা অনুসারে এলাকার লোকজনকে জানাতে হবে, তাদের হিয়ারিং-এর সুযোগ দিতে হবে, এসব কতগুলো পদ্ধতি আছে। খুব সম্ভবত এটা ফরেষ্ট অফিসার হিসেবে এডিসি রেভিনিউ বা ডিসি সাহেব হিয়ারিং করেন। ঐ পদ্ধতিগুলো সঠিকভাবে হয়েছে কিনা এটা আপনারা দেখতে পারেন।

আমি যতটুকু জানি, during insurgency period তারা এই পদ্ধতিগুলো মানে নাই। না মেনেই রিজার্ভ ফরেস্ট ডিক্লেয়ার করেছেন- এগুলো যদি কোর্টে দেখাতে পারেন আমার মনে হয় ফরেস্ট ডিক্লেয়ার করার whole procedure-টাই বাতিল হয়ে যাবে; সেটা গেজেট নোটিফিকেশন হলেও। কারণ these procedures were not followed। কারণ যাদের জমি সরকার নিয়েছেন তাদের বক্তব্য শোনার বা বলার সুযোগ দেননি, এটা হলো আইনের বড় একটা দিক। যার বিরুদ্ধে আপনি সিদ্ধান্তটা নিবেন তাকে যদি কিছু বলার অধিকার না দেন, তাকে বক্তব্য পেশ করার অধিকার না দেন তাহলে সেই সিদ্ধান্তটা কার্যকর হতে পারে না।

আরেকটা বিষয় হলো- ১৯২৭ সালের বন আইন। সেটা হলো general law। এই general law সমগ্র দেশেই প্রযোজ্য। আর আমাদের এখানে যে আইনগুলো আছে বিশেষ করে Hill District Council Act, তারপর ভূমি কমিশন আইন এগুলো হলো special law; বিশেষ সীমিত এলাকায় যার কার্যকারিতা। আইনের সাধারণ নীতি হলো যে, where there is a diference between general law and special law, the special law will prevail over the general law। এটা হলো আইনের সাধারণ নিয়ম। যেমন CHT Regulation-ও কিন্তু special law।

অরুন লাইব্রেস প্রশ্ন করেন, স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও আসল মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজা হচ্ছে, লিস্ট করা হচ্ছে। সেখানেও কিন্তু আমরা বাদ পড়ছি। আমরা সরকারের কাছে যে জিনিসগুলো দাবী করছি সেগুলো কতটুকু কার্যকরী হবে সেটা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভূমি থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এই কর্মশালা তাদের কতটুকু উপকারে আসবে আমি ঠিক বলতে পারছি না।

অনেক আগে ভূমি বিষয়ে একটা ওয়ার্কশপ হয়েছে। একটি বিদেশী সংস্থা আমাদের টাকা দিয়েছিল। সে টাকা দিয়ে আমরা ওয়ার্কশপ করেছি। ফ্যানের বাতাসে ভাল খেয়েছি, তারপর বাসায় চলে গিয়েছি। কিন্তু কতটুকু উপকার হয়েছে? ভূমি সমস্যাগুলো নিরসন না হয়ে আরো জটিলতর হয়েছে। গৌতম বাবু ভূমি বিরোধের মামলার কথা বলেছেন। কিন্তু ভূমি বিরোধের মামলার খরচ চালানোর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই আমি বলতে চাই যে, আজকে ওয়ার্কশপ-এ যে টাকাটা আমরা অপচয় করছি সেই টাকাটা যদি ওদের জন্য ব্যয় করতাম তাহলে অনেক উপকার হতো।

আইডিবি ভবনে PRSP মিটিং-এ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, আমাদের মূল সমস্যা ভূমি বিরোধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুই হচ্ছে না। সুতরাং কি করলে কি হবে সে ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। শুধু ভূমি বিরোধের কথা বললে তো সমাধান হবে না। আমরা কেমন করে মাঠে নামবো এবং কেমন করে ভূমি পুনরুদ্ধার করবো এটাই হচ্ছে আসল বিষয়। সুতরাং সে বিষয়ে আপনারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন এটাই আমার জানার বিষয়।

এর উত্তরে গৌতম দেওয়ান বলেন, এ বিষয়ে আমি অরুন লাইব্রেস বাবুর সাথে সামান্য একটু দ্বিমত পোষণ করবো। এটা বাস্তব সত্য বা এর সত্যতা আমি অস্বীকার করবো না যে, ভূমি সমস্যা উত্তরোত্তর জটিলতর হচ্ছে। তবে আজকে কর্মশালায় আমরা অপচয় করছি এটা বোধহয় বলা ঠিক নয়। কারণ আমাদের এভাবে বসার দরকার আছে। আপনি বললেন, সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়; সেটা করতে গেলে তো আমাদের সমন্বিতভাবে বসতে হবে। এখানে জনপ্রতিনিধিরা আছেন, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তারা আছেন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আছেন; তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, বিভিন্ন সেকশন থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন; আমাদের সবার সমন্বয় যদি না থাকে তাহলে আমরা সমস্যার প্রকাশটা কিভাবে বুঝবো এবং তা নিরসনের জন্য যদি কোন পদক্ষেপ নিতে যায় সেক্ষেত্রেও আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। সেই সমন্বিত প্রচেষ্টার জন্য আমাদের বসা দরকার। আর বসার জন্য এই সমস্ত কর্মশালা। এটাকে যদি আমরা অপচয় বলি সেটা ঠিক নয়। আশা করি আমি বুঝাতে পেরেছি।

রাংলাই ম্রো, ইউপি চেয়ারম্যান, বান্দরবান প্রশ্ন করেন যে, সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হলো, চুক্তির ২৬(ক) ধারাতে বলা আছে যে, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু লেখা থাকুক না কেন পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তীযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইহা ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না"। আবার দ্বিতীয় প্যারাতে বলা আছে- "তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (রিজার্ভ) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের

নামে রেকর্ডভূক্ত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না"। এটা একটু পরিষ্কার হওয়ার দরকার আছে এই জন্য যে, আমরা আশংকা করছি, যেগুলো ইতিমধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেছে সেসমস্ত ভূমিগুলোর ক্ষেত্রে ভূমি কমিশন কিভাবে কাজ করবে এটাই ছিল উনার প্রশ্ন।

সুকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, আমি তো প্রথমেই বলেছি যে, এটা সাধারণ আইন (general law) এবং বিশেষ আইন (special law)-এর মধ্যে একটা সংঘর্ষ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন হলো বিশেষ আইন (special law)। আর ১৯২৭ সালের বন আইন হলো সাধারণ আইন (general law)। এখানে বলা আছে যে, সেখানে যদি সংঘর্ষ দেখা দেয় তাহলে special law-টাই prevail করবে বা ঠিকে যাবে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আপনার ধারণাটা পরিষ্কার হয়েছে। আর আপনি যেটা বলেছেন রিজার্ভ ফরেষ্টগুলোর নোটিফিকেশন হয়ে গেছে, তবে আমার মনে হয় এগুলোর নোটিফিকেশন হয়ে গেলেও সেখানে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই।

এসব বিষয়ে তদন্তের জন্য আমি বেশ কতগুলো এলাকায় গিয়েছি। রাজস্থলীতেও গিয়েছি এবং সেখানকার তথ্য নিয়েছি। রাজেস্থলীতে সরেজমিনে গিয়ে দেখেছি যে, বন আইনের যে বিশেষ বিধানগুলো আছে সেখানে সেগুলো মানা হয়নি। ঐ অঞ্চলের লোকদেরকে নোটিশ দেয়া হয় নাই এবং তাদের কোন বক্তব্যও নেয়া হয় নাই। এভাবে একটা সম্পূর্ণ মৌজা রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে গেলো। তাহলে এখানে প্রশ্ন আসছে যে, মৌজা কখন হয়? বন-জঙ্গল নিয়ে তো আর মৌজা হয় না। মৌজার একটা সংজ্ঞা আছে যেখানে লোকজন থাকবে। তাহলে যেখানে একটা লোকেরও হিয়ারিং নেওয়া হলো না, তাদের কোন বক্তব্য শোনা হলো না, সেটা কিভাবে রাতারাতি রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে যায়? তাহলে আইনে এই হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেন? জঙ্গলের গাছ-বাঁশের বক্তব্য নেয়ার জন্য নাকি পশুপাখির কথা শোনার জন্য? ব্রিটিশরা এই নিয়মগুলো রেখেছে কেন? এগুলো রাখা হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনের কথা শোনার জন্য।

ফাইলগুলোতে আমি দেখেছি তাদের কোন বক্তব্যই নেয়া হয় নাই। তার পরিবর্তে যে তথ্যটা পাওয়া গেলো সেটা হলো সেগুলো ইনসারজেন্সী এলাকা, সেখানে আমরা যেতে পারি না এবং কোন লোকজন নাই। ভাল কথা, সেখানে নোটিশ প্রদানও করা হলো না কেন? তাহলে সেখানে বিস্তীর্ণ একটা মৌজা রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে যায় কিভাবে?

গৌতম কুমার চাকমা বলেন, বন বিভাগের ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে আমি একটু যোগ করি। ২০০৩ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে সামাজিক বনায়ন বিষয়ে বন মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হয়, সে বৈঠকে বিশেষ করে pulpwood বিষয়ে কথা হয়। এক পর্যায়ে সেখানে পুরো একটা মৌজা বেদখল বা অধিগ্রহণ করা হয়েছে একথাটা উঠে আসে। একথাগুলো উঠার পরিপ্রেক্ষিতে বন বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, না এগুলো সঠিক নয়। আমরা বলেছি এগুলো সঠিক। সেখানে হেডম্যানসহ সকলে উৎখাত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, পদ্ধতিগতভাবে হলে হেডম্যানসহ কিভাবে উৎখাত হয়ে যায়? তখন বনমন্ত্রী বন বিভাগের লোকদেরকে বলেছিলেন, সমতল এলাকা হলে আপনারা কি এটা করতে পারতেন?

এটা দেখার জন্য পরে একটা কমিটি গঠন করে ঐ কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নামমাত্র একটা কমিটি করে আঞ্চলিক পরিষদকে চিঠি দিয়েছিলেন। এর বিপরীতে আমরা মতামত দিয়েছি এবং আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরাকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। তদন্ত করে তিনি রিপোর্টও দিয়েছেন। তদন্তের রিপোর্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়েও প্রেরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যদি সবল হতো অথবা বন মন্ত্রণালয় যদি সঠিক হতো তাহলে এতক্ষণে

প্রশাসনিক পদক্ষেপেই তা বাতিল হয়ে যেতো। কারণ এগুলো পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে এবং বেআইনীভাবে জবরদখল করা হয়েছে। এসব বেআইনীভাবে দখলকৃত ভূমির মামলার জন্য আমাদের আলাদা একটা সংস্থা দরকার। আর এক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা না হলেও অন্তত হাজার হাজার টাকা প্রয়োজন। এখন নেতৃত্ব দেবে কে? এখন তো আর সেই বন্দুক নিয়ে বন্দুক দেখিয়ে এসব ফেরৎ নেয়া যাবে না। গণতান্ত্রিক সমাজের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনগত পদ্ধতিতে এগুলো করতে হবে। ধন্যবাদ।

এ সময় প্রশ্ন করা হয় যে, চুক্তির পূর্বে যে সব ভূমি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে এক্ষেত্রে ভূমি কমিশনের কোন এক্তিয়ার আছে কিনা? সুকৃতি রঞ্জন চাকমা আরো বলেন, ১৯২৭ সালের বন আইন হলো general law। যাদের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তাদের হিয়ারিং হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি না হয়ে থাকে তাহলে গেজেট প্রকাশ হলেও তা বাতিলযোগ্য।

বিশ্ব কল্যাণ চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান, দীঘিনালা প্রশ্ন করেন, বেদখলকৃত অনেক জমি আইনগতভাবে ফেরত দেয়ার এবং বেদখল উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হলেও আজ পর্যন্ত সেটা কার্যকর হচ্ছে না। বার বার চেষ্টা করার পরেও এক্ষেত্রে আইনী সহযোগিতা কেবল লিখিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ আছে, বাস্তবায়নে নেই। এমতাবস্থায় করণীয় কি হতে পারে?

এর জবাবে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, উনি যেটা বলেছেন এটা তো স্বাভাবিক। এখানে মূল বিষয়টি হলো আইনের শাসন দেশে তো নেই; পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও বেশী নেই। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল আদিবাসী পাহাড়ীদের দ্বারা বা যারা পুরনো বসতিপ্রাপ্ত বাঙ্গালী তাদের আবাসভূমি থাকবে কিনা এ নিয়ে তো রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজ করছে। সে সমস্যা সমাধানের জন্য একটা চুক্তি হয়েছে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির তো এখনো পরিবর্তন হয়নি। বিগত ৯ আগষ্ট তারিখে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের কমিশনার একটা বাণী দিয়েছেন। বাণীতে তিনি লিখেলেছেন আমরা আইনগতভাবে অনেক instruements তৈরী করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় নাই।

অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য এ অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল থাকবে, এখানকার অধিবাসীদের অধিকার রক্ষিত হবে এভাবে একটা চুক্তি হলেও চুক্তির অনুকুলে যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার তা এখনো গড়ে উঠেনি। এমনিতেই সাধারণভাবে দেশে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে আর এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যাটা মূল সমস্যা আর এটা নিয়ে মূল বিরোধ হচ্ছে রাজনৈতিক বিরোধ আর জাতিগত অস্তিত্বের প্রশ্ন। সেটাই আমি আমার প্রবন্ধে লিখেছি।

আর আপনারা তো আমার চেয়ে আরো বেশী ভাল বলতে পারবেন যে, এই মামলা নীচু থেকে শুরু করে করে ঐ সুপ্রিম কোর্টে যায়। এই ভূমি সমস্যাগুলো ঘুরে ফিরে আবার ঐ হাইকোর্টে যায়। যেখানে রায় হোক না কেন, এই জায়গা মালিককে আবার উচ্ছেদ মামলা করতে হয় সেই নিম্ন আদালত থেকে। এই নিম্ন আদালত থেকে উচ্ছেদ মামলা সম্পন্ন হওযার পরও সেটা কিন্তু সমাধা হয় না। এরকম একটা ঘটনা আছে দীঘিনালার কবাখালী মৌজায়। সেখানে অশ্বিনী তালুকদারের ছেলেরা একটা মামলা করেছে, প্রথমে দখল পাওয়ার জন্য মামলা, তারপর উচ্ছেদ মামলা। উচ্ছেদ মামলায় উনারা চট্টগ্রাম জর্জকোর্ট থেকে রায় পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে এই ভূমি বিরোধের বিষয়টা টাস্কফোর্সের মিটিং-এ উঠে। সে কথার সুত্র ধরে নতুন করে আবার সে মামলা শুরু হয়ে যায় উপজেলা আদালত থেকে।

তাহলে দেখুন উচ্ছেদ মামলা নিস্পত্তি হয়ে যাওয়ার পরও আবার সে মামলা শুরু হয়েছে অবৈধভাবে। যিনি শুরু করেছেন সেই বিচারকের বা সেই প্রশাসনিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মামলা হতে পারে। যে উচ্ছেদ মামলার রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে তিনি আবার সেই মামলা শুরু করে দিলেন কিভাবে? এটাতো তিনি নিতে পারেন না। এই হলো বিষয়।

সরকার না করলে বিকল্প থাকে আইনী সহায়তা। এজন্য আর্থিক সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। এগুলো না হলে একজন গরীব মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে বসবে। কারণ এখানে শুধু মামলার কথাটা দেখলাম। এই মামলার সাথে যে উকিলের ফিস, কর্মকর্তার ঘুষ, বিচার কার্যের ঘুষ এবং আরো অগণিত ঘুষ জড়িত। এই পরিস্থিতিতে ডানিডার সহযোগিতায় আজকের যে ওয়ার্কশপ হতে চলেছে আমার বিশ্বাস এই ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে যে সুপারিশমালা বেরিয়ে আসবে সেই সুপারিশমালার ভিত্তিতে (ভূমি কমিশন সক্রিয় না হলেও) ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছুটা হলেও আইনগতভাবে বা আর্থিকগতভাবে সহযোগিতা নিয়ে অগ্রগতি সাধিত হবে। আমি আশাকরি, কর্মশালায় যে সুপারিশমালা উঠে আসবে সেই সুপারিশমালার ভিত্তিতে দাতাসংস্থা; দাতাসংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের সুমন সাহেব উপস্থিত আছেন উনারা এগিয়ে আসবেন।

আমি জেনে খুশী হয়েছি মিজ নাটালিয়া বিকালে আসবেন। রাজনৈতিক ভয়কে আসল মনে না করে উনারাও এই সমস্যাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন। এখানে ভূমি বললে শুধু এখানকার কর্মকর্তারা নয়, অনেক সময় দাতাসংস্থারাও পিছু হটে যায়। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, ১৯৯৭ সালে চুক্তি হওয়ার পর ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে যখন দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশকে সহায়তা সংক্রান্ত একটা মিটিং হয় তখন দাতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বলা হয়, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য এবং সেটেলারদেরকে সমতল ভূমিতে নিয়ে আসার জন্য আমরা টাকা দেব। দাতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এরূপ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কারণ তার আগে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে নানাভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলা হয়েছিল এবং উনারা convinced হয়েছিলেন। ইউরোপীয় কমিশন প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যে, এই সমস্যা সমাধানে উনারা অর্থ দেবেন।

সেই সুত্র ধরে চুক্তি পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে তারা অর্থ সাহায্যের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, না আমাদের টাকার দরকার নেই। আমরা আমাদের টাকায় সমাধান করতে পারবো। এটা কেন হলো? এজন্য দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম। এখানে প্রশ্ন এসেছে কিভাবে সমাধান হবে? ১৯৯৭ সালের চুক্তিই তো সমাধান। এই সমস্যার একটা গণতান্ত্রিকভাবে উপায়ে সমাধান পাওয়ার জন্য তো এই চুক্তি। আমাদের গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের জন্য এবং আইনগত সমাধানের জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেটার কোন বিকল্প আছে বলে আমি অন্ততঃ মনে করি না। ধন্যবাদ।

বিশ্বপ্রিয় কার্বারী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, খেদারমারা ইউনিয়ন, বাঘাইছড়ি প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন, ১৯৭৯ সালে যখন বহিরাগত সেটেলাররা আমাদের অধিকাংশ জায়গা জমি-দখল করতে গেলো তখন সরকার তাদেরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে তিনটি মৌজা সৃষ্টি করে সেগুলো হলো কালাপাকজ্যা, আমতলী এবং গুলসাখালী। এই তিনিটি মৌজার মধ্যে বিশেষ করে আমার সমস্যাটা হচ্ছে কালাপাকজ্যার সাথে। আমার এলাকা হচ্ছে দক্ষিণ পাবলাখালী। এই মৌজার সেটেলাররা আমাদের অধিকাংশ চাষযোগ্য জায়গা জমিগুলো দখল করে নেওয়ার পরও সরকারী বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলের সহায়তায় বর্তমানেও তারা আমাদের জমি দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সেখানে জেলা প্রশাসন এবং সেনা প্রশাসনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

সেটেলারদের বহু পরিবার মৌজার বাইরে থেকেও বলছে তারা মৌজার ভিতর আছে। কালাপাকজ্যা মৌজার সীমানা ঠিক করার জন্য অনেক বার বলার পর ডিসি সাহেব মৌজার সীমানা নির্ধারণ করতে উদ্যোগ নেন। কিন্তু সেটেলার বাঙালী ও সেনাবাহিনীর বাধাদানের ফলে উক্ত সার্ভে টীম সীমানা ঠিক করতে পারে নাই। পক্ষান্তরে এডিসি সাহেব যিনি কমিটি গঠন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম জর্জ কোর্টে একটা মামলা করা হয়েছিল। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ডিসি সাহেব বা এডিসি সাহেব কেন ঐটা সামাধা করতে যাচ্ছেন না? যেহেতু উনি সিদ্ধান্ত দেওয়ার আইনগত মালিক। কারণ আইনগত

দিক দিয়ে মৌজার সীমানা নির্ধারণ হওয়া উচিৎ। মৌজার জন্য সেটেলারদেরকে তিন হাজার একর জায়গা দেওয়া হয়েছে। তিন হাজার একর মেপে দিলে ওদের অসুবিধাতা কোথায়।

এখানে আপনারা বিভিন্ন প্রতিনিধি আছেন আপনাদের মাধ্যমে ডিসি সাহেবকে বলা যেতে পারে যাতে বিষয়টা দ্রুত নিস্পত্তি করে দেন। তার কারণ, আমি কয়েকবার গিয়ে দেখেছি, যেদিন ঐ মামলার তারিখ পড়বে সেদিন বলা হয় ডিসি সাহেব আসেন নাই বা বিবাদী আসেন নাই। এভাবে আমি এবং আমার এলাকাবাসী হয়রানির শিকার হচ্ছি। অন্যদিকে হাইকোর্টে আপিল করার মত সামর্থও আমাদের নেই। সে ব্যাপারে আমার এলাকাবাসীকে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনভাবে সহযোগিতা দেয়া যায় কিনা আমি মাননীয় অতিথিবৃন্দের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি।

জবাবে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, উনি এতক্ষণ ধরে যেটা কথাটা বললেন সে ধরনের সমস্যা আরো অনেক আছে সে এলাকায়। তিনটি মৌজার কথা বলেছেন তিনি। ঐখানে যে মাইনীমুখ আছে, আরো একটি মৌজা আছে রাঙ্গীপাড়ার ওদিকে, সেখানেও একই ধরনের সমস্যা। এখানে বন বিভাগের কাছ থেকেও সম্মতি আসছে নতুন মৌজা হবে এবং সেখানকার যারা পাহাড়ী তারা সেখানে অন্তর্ভূক্ত হবে। কিন্তু সেখানে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তি আছে। এ কারণে সেগুলো ঝুলিয়ে আছে।

উনি ওয়ার্কশপে যে সমস্যাটা তুলে ধরেছেন সেটাও একই। বিশেষ করে সেসব এলাকায় সেনা কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে বরকল এবং লংগদু উপজেলায় সেটেলাররা ঘোষণা দিয়েছিল, "এখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এখন জমিজমা সব আমাগোর।" এভাবে তারা বাড়িঘরও দখল করেছিল লংগদু এলাকায়। তখন মনিস্বপন বাবুকে বলা হয় আপনি তো মন্ত্রী আপনি যদি গিয়ে একটু দেখে আসেন তাহলে সেখানকার লোকজন রক্ষা পাবে। তারপর তিনি লংগদু এবং বরকল থানায় গিয়েছিলেন। উনার যাওয়ার প্রেক্ষিতে সেখানে যারা এখন 'আমাগো সরকার ক্ষমতায়, জমিজমা সব আমাগোর' বলতেন তাদেরকে তিনি বলে এসেছেন এসব জমি যাদের আছে তাদেরই থাকবে। এখন এভাবে বেদখল করা যাবে না। তার প্রেক্ষিতে অন্তত কিছুটা হলেও থেমে গিয়েছিল। আর না হলেও এতক্ষণে সব জায়গা বোধ হয় বেদখল হয়ে যেতো। সে সময় ঢাকায় এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মন্নান সাহেবের সঙ্গে এক বৈঠক হয়। বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেটা এখানকার সেনা কর্তৃপক্ষরা জানে না। উনারা জানতেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে মান্নান সাহেব আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কথা বলছেন। আর এটাই হলো বাস্তব ঘটনা।

আপনি যেটা তুলে ধরেছেন এটা খুব জটিল সমস্যা। এ ধরনের সমস্যায় যদি আইনগত বা আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া যায় তাহলে মোকাবেলা করতে অনেকটা সুবিধা হবে। কারণ আদালতকে সবাই ভয় করে। আদালতে গিয়ে তো আর সেনা সদস্য বলতে পারবেন না এখানে আমার দ্বিমত আছে। উনিতো আর সেখানে দাড়িঁয়ে সেটা বলতে পারবেন না। ধন্যবাদ।

এসময় ডানিডার কর্মকর্তা হোসেন শহীদ সুমন অংশগ্রহণ করে বলেন, অনেক্ষণ ধরে খুব interesting আলোচনা শুনছিলাম। এখানকার যারা আদিবাসী বিষয়ে এবং ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারা অনেক সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। আমি একটা বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করতে চাই। এখানে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল যে, এই আইনে এই বলা আছে, এটা আমাদেরকে রক্ষা করে কিনা, আমরা আইনগত সহযোগিতা পাবো কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে প্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষকে সেবা করার জন্য আইন, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়। যে আইনে যাই বলা হোক না কেন, তা যদি প্রচলিত international norms and standards and human rights principles বা মানবাধিকারের পরিপন্থী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যে কোনভাবে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। পূর্বে গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলেও তা করা যাবে।

একজন বলছিলেন, যদি বিধি মোতাবেক না হয়ে থাকে সেটিও চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এজন্যেই আমাদের specific law-এর মধ্যে যদি প্রতিকার থাকে তাহলে আমরা নিম্ন আদালতে গিয়েই প্রতিকার চাইতে পারি। কিন্তু যদি আইনে সুনির্দিষ্ট করা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? আমরা অবশ্যই হাইকোর্টে যেতে পারি। রিট আবেদন দাখিল করতে পারি। সেখানে আমাদের human rights violation-গুলো অবশ্যই উত্থাপন করা যাবে; এটি যে আইনে বলা থাকুক না কেন। কারণ বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। এটি কোন ধর্মীয় গ্রন্থ দ্বারা পরিচালিত নয়। সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত বিধায় সংবিধান সৃষ্ট যে সমস্ত আইন আছে সে আইনের মধ্যে সরকারকেও চলতে হয় বা সে আইন মেনে নিতে তারাও বাধ্য থাকে। ফলে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারও সবার আছে। উনি বলছিলেন যে, একটি মৌজায় যেখানে right to hearing, right to self-defence আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ যদি না দেয়া হয়ে থাকে, সরকার যদি একতরফাভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, যে কোন সময়েই কোন time limitation ছাড়াই বা কোন obligation ছাড়াই সেটি আবার পুনরুত্থাপন করা যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় আলোচনায় বার বারই আসছে সেটা হলো, আইনগত সহযোগিতা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে। এটার সাথে আর্থিক বিষয় জড়িত আছে। তবে আমার মনে হয়, সেটি খুব একটা বড় সমস্যা নয়। আইনগত সহযোগিতা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে বা তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে আমার কাছে এটি খুব একটা বড় সমস্যা মনে হচ্ছে না। কারণ আপনাদের যদি সমতল অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকে সেখানে অসংখ্য মানবাধিকার সংস্থা আছে এবং যারা অহরহ এ সমস্ত আইনী বিষয় নিয়ে নিম্ন আদালতেও মামলা লড়ছে এবং সরকারের সাথে উচ্চ আদালতেও মামলা লড়ছে। সরকার কখনই তাদেরকে বাধা দিচ্ছে না। কারণ আমরা সবাই জানি যে, মানবাধিকার একমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃকই লঙ্ঘিত হতে পারে কোন ব্যক্তি দ্বারা মানবাধিকার কখনই লঙ্ঘিত হয় না। রাষ্ট্র যেহেতু মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সেহেতু রাষ্ট্রকেও আপনার আইনের অধীনে আনতে হবে। তার জন্য উচ্চ আদালতে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আছে।

আমি বলবো যে, দাতাসংস্থা হিসেবে আমরা অনেকগুলো মানবাধিকার সংস্থা বা legal aid organization-কে সাপোর্ট করছি যারা এই আইনগত সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। কোন মামলা নিয়ে যদি আপনার উচ্চ আদালত পর্যন্ত যেতে হয় আমার মনে হয় যে, বেশ কটি সংস্থা যেমন Bangladesh Legal Aid Services Trust (BLAST)-কে সহযোগিতা করছি; মানবাধিকার বাস্ত বায়ন সংস্থাকে সহযোগিতা করছি। এই সমস্ত সংস্থার কর্মকান্ডের মধ্যে আর্থিক এবং আইনী সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি আছে। BLAST-এর পক্ষ থেকে ড. কামাল হোসেন উচ্চ আদালতে অহরহ writ petition করে থাকেন। সেক্ষেত্রে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অর্থ দিতে হয় না কারণ ড. কামাল হোসেনকে pay করার মত সামর্থ এদেশে শতকরা আশি জনের নেই।....

এখানে একজন প্রশ্ন তুলেছেন যে, এ ধরনের কর্মশালার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। হ্যাঁ এ ধরনের অনেক কর্মশালা হয়েছে। আমার মনে হয় যে, হয়ত আমরা রেজাল্টটা দেখছি না। ফলাফল আমরা খুব তাড়াতাড়ি পাচ্ছি না। কিন্তু আমারও মনে হয় কৌশলগুলো নির্ধারণ করতে হবে কিভাবে আমরা সে সুযোগগুলো নিতে পারি। আর আইনগত সহায়তার জন্য আমার মনে হয় যে, কোন দাতাসংস্থা যারা অন্তত human rights and good governance নিয়ে কাজ করছে সে সমস্ত সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন করলেই যে কোন ধরনের আইনগত সহায়তার জন্য তারা এগিয়ে আসবে। ফলে আর্থিক বিষয়টিও এখানে কখনো মুখ্য হতে পারে না। ধন্যবাদ সবাইকে।

আহমদ মিয়া, ঝগড়াবিল কার্বারী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, আমি যতটুকু জানি কাপ্তাই বাঁধ দেওয়ার আগে এখানে চুক্তি হয়েছিল এই দেশের রাঙ্গামাটির মানুষের সাথে। সেই বইটা এখনো

আমার কাছে আছে। আমার প্রশ্নটা হলো, ঐখানে আমাদের ক্ষতিপুরণ দেয়া হবে এবং জায়গা দেয়া হবে এটা চুক্তির মধ্যে আছে। চুক্তিতে লেখা ছিল যে, প্রথম পর্যায়ে ক্ষতিপূরণ দেবে আমাদের জায়গা নেবার জন্য। আর জায়গায় বসিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু তা করা হয় নাই। কাপ্তাই বাঁধের উদ্বাস্তুদের অর্ধেকের বেশী অংশ জায়গা পায় নাই। আমি যা পেয়েছি আজ পর্যন্ত আমাকে মেপেও দেয়া হয় নাই। তাহলে আমার প্রশ্ন হল, এ বিষয়ে আমরা কিছু করতে পারব কিনা? কাপ্তাই বাধেঁর উদ্বাস্তুদের টাকা ও জমি দেয়ার কথা ছিল। এখনো তা সবাই পায় নাই তা কিভাবে পাওয়া যাবে?

এর জবাবে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, আমরাও কাপ্তাই বাধেঁর উদ্বাস্তু, লংগদুতে ছিলাম বর্তমানে মাইনীতে। উনি যেটা বলেছেন সেটা হলো কাপ্তাই বাঁধ যখন হয় তখন নির্ধারিত ছিল যে, জায়গা জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের যে আইন সে আইন বলে জায়গা জমিগুলো অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণ করার ফলে জায়গা-জমিগুলো সরকারের হয়ে গেছে। জায়গা-জমিগুলো সরকারের হয়ে যাওয়ার পর আর এগুলোর কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। দেয়া হয়েছে কেবল ফল গাছের, এক বছরের ফসলের অথবা ঘরের ক্ষতিপুরণ। এ বিষয়ে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন করার মত অথবা মামলা করার মত আজকের দিনটি পর্যন্ত কেউ ছিল না বলে এটা এখনো সেভাবে আছে। আর পৃথিবীর অনেক জায়গায় এভাবে বাঁধ দিয়ে যারা উৎখাত হয়েছে এমন মানুষের আন্দোলন হয়েছে। এটাও যদি সেভাবে আন্দোলন গড়ে উঠে আমার মনে হয় পরবর্তীতে সেটা কার্যকরভাবে সমাধা হতে পারে।

এখানে আমি সুমন সাহেবের কথার সঙ্গে আরও একটু যোগ করি, উনি যে বললেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও মামলা করা যায় এটা কিন্তু অনেক দেশেই হচ্ছে। বিশেষ করে কোন দেশ যদি জাতিসংঘের কোন convention বা কোন চুক্তি স্বাক্ষর করে তাহলে সেই convention বা treaty-র সুত্র ধরে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। আমাদের সরকার ১৯৭২ সালে ILO Convention-107 স্বাক্ষর করেছে আর ১৯৬৯ সালে যে Convention হয়েছে সেটাও কিন্তু যারা জাতিসংঘের সদস্য তারা automatically ratify করেছে। এভাবে অন্যান্য আরও য়ে সমস্ত convention বা treaty আমাদের সরকার স্বাক্ষর করেছে এগুলোর সুত্র ধরে চুক্তি বা মানবাধিকার লংঘনের জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের কোর্টগুলোতে মামলা করা য়ায়।

আমি এ বছরের জুলাই মাসে যখন জেনেভায় গিয়েছিলাম আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপে বক্তব্য রাখার চেয়ে আমরা আইনগতভাবে এ বিষয়ে কিভাবে আরও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পেতে পারি তা যাচাই করে দেখা। এ বিষয়ে doCip-এর কর্মকর্তা এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপার্সন- দুজনের সাথে আমার কথা হয়। বিশেষ করে doCip-এর মহিলা কর্মকর্তার সাথে আমার বিস্তারিত আলাপ হয়। এখানে আদিবাসী বিষয়ে অনেক intervention হয়। এই intervention-এর সমাধা হয়েছে বিশেষ করে ফিলিপাইনে। এটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, আজকে যারা এনজিও করছেন বা intervention perspective-এ আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে যাদের জানা আছে আমার মনে হয় তারা যদি একটু উঠে আসেন তাহলে এই এভিন্যু বা সুযোগগুলোও আমরা ব্যবহার করতে পারি। ধন্যবাদ।

অশোক কুমার চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি জানতে চেয়ে বলেন যে, আমি আইনের ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক না। আমি ঠিক জানি না, বিশেষ করে কিছুক্ষণ আগে আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় যখন general law এবং special law নিয়ে কথা বলছিলেন ঠিক সে প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে সম্ভবত মাসখানেক আগে পত্রিকায় পড়েছিলাম রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টসের যে একটা মামলা হয়েছিল সেখানে একটা মন্তব্য করা হয়েছিল হিল ট্র্যাক্টস

রেগুলেশন হচ্ছে একটা "ডেড ল" (dead law)। এবিষয়ে আপনাদের মন্তব্য কি একটু জানতে চাচ্ছি।

এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে গৌতম কুমার চাকমা বলেন, আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন কেন "ডেড ল" (dead law) হবে এ মতামতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করার। কারণ এটার এখনো কার্যকারিতা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বাস্তবতা আছে। তাহলে সেই বিচারক একতরফাভাবে কেন "ডেড ল" (dead law) হিসেবে মত দেবেন এটার বিরুদ্ধে রিট পিটিশন করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী সে পাহাড়ী হোক বাঙ্গালী হোক প্রত্যেকের এ দায়িত্ব রয়েছে।

আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে লিগ্যাল এডভাইজারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এ বিষয়টি দেখার জন্য। উনি দেখছেন যে, এ বিষয়ে রিট পিটিশন করতে হয় কিনা। আর আঞ্চলিক পরিষদ করুক বা না করুক অন্য নাগরিকদের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে এগিয়ে আসা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ এভাবে শুধু এই আইন নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অনেক অধিকারও একতরফাভাবে কোর্টকে ব্যবহার করে খর্ব করা হয়েছে। এভাবে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদাকে (Special Status) খর্ব করা হয়েছে। অন্যদিকে "ইনার লাইন রেগুলেশন"-এর (Inner Line Regulation) অধিকারও খর্ব করা হয়েছে। এখানে যারা unwanted তাদেরকে বহিস্কার করার যে অধিকার সেটাও খর্ব করা হয়েছে। এভাবে নানা উপায়ে আমাদের আইনগত অধিকারগুলো কেড়ে নেয়া হচ্ছে। ধন্যবাদ।

এ সময় এ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা এ প্রশ্নের সম্পুরক উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, একদিকে হাইকোর্ট রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টসের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে Chittagong Hill Tracts Regulation-কে "ডেড ল" (dead law) বা অকার্যকর বলছে অপরদিকে রায়ের পর সরকার আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Chittagong Hill Tracts Regulation কার্যকর থাকবে বলে আরেকটি গেজেট বের করেছে। তাহলে সরকার হাটছে একদিকে, আর হাইকোর্ট দিয়েছে অন্য finding। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে, আসলে বাংলাদেশে দানবরাই বেশী শক্তিশালী হচ্ছে। দেশে আইনের শাসন আর নাই। সবকিছু চলছে গায়ের জোরে। Chittagong Hill Tracts Regulation যেহেতু এখনো বিদ্যমান এবং প্রশাসন থেকে শুরু করে আইন মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বলবৎ আছে বলে গেজেট বের করেছে সুতরাং এর কার্যকারিতা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ নেই। ধন্যবাদ সবাইকে।

শক্তিপদ ত্রিপুরা, সভাপতি, হেডম্যান এসোসিয়েশন, খাগড়াছড়ি বলেন, আমি শুধু লাট সম্পত্তি বিষয়ে কিছু যোগ করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে মং সার্কেলের বিষয়ে। আমি অল্প কিছুদিন আগে, একমাস হবে বোধহয় জানতে পারলাম যে, খাগড়ছড়ির অর্থাৎ মং সার্কেলের কিছু লাট সম্পত্তি আছে। জানতে পেরেছি যে, বর্তমান মং রাজা ও পুরনো মং রাজপরিবারের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে এই লাট সম্পত্তি নিয়ে। আর সেটা হচ্ছে যে, উভয়েই দাবী করছে যে, এই লাট সম্পত্তি হচ্ছে রাজার সম্পত্তি। এটা রাজারাই ভোগ করবে। পানছড়ি মৌজার একজন হেডম্যান ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। তার থেকে জানতে পারলাম যে, পানছড়ি, রামগড় এবং আরও বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে এই ধরনের লাট সম্পত্তি। বর্তমানে পানছড়ির জায়গা নিয়ে মং সার্কেলে বিরোধ চরমে। সেটা অনেকটা মামলার পর্যায়ে যাবার অবস্থা।

ভূমি বন্দোবস্তী, হস্তান্তর, ইজারা ও অধিগ্রহণ পদ্ধতি

এ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা

শুভ অপরাহ্ন। নমস্কার সবাইকে। আমার সেসনের জন্য নির্ধারিত সময় বরাদ্দ ছিল লাঞ্চের আগে। পূর্ববর্তী বক্তা একটু বেশী সময় নেয়াতে আমার সেসনটা লাঞ্চের পরে চলে আসলো। শুরু করার আগে আমি দুয়েকটি কথা বলতে চাই। আসলে আজকে আমি যে বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করতে যাচ্ছি তার নির্ধারিত রিসোর্স পার্সন ছিলেন সম্মানিত রাজা দেবাশীষ রায়। উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়াতে উনার জায়গায় কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ করে আমাকে বলা হয়েছিল এ বিষয়ের উপর আলোচক হিসেবে যোগ দিতে। তাৎক্ষণিকভাবে আমি কোন concept paper তৈরী করতে পারি নাই। সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

আমি কেবল গুরুত্বপূর্ণ আইনগত দিকগুলোর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করবো। আমার আলোচনার পর আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন করার থাকে আপনারা করতে পারবেন। আমার আগে যিনি বক্তা ছিলেন সম্মানিত আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য শ্রী গৌতম কুমার চাকমা উনি ভূমির উপর বিস্তারিত অনেক কিছু আলোচনা করে গেছেন। প্রশ্নোত্তর পর্বও বেশ প্রাণবন্ত ছিল। এজন্য আমি ভূমির উপর খুব বেশী আলোচনায় যাবো না। আমি সরাসরি অন্য বিষয়গুলোতে চলে যাচ্ছি।

প্রথমেই ভূমি বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়াটা কি রকম তার উপর আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রে আইনগত বিধান যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে বলবো ভূমি বন্দোবস্তী পদ্ধতির মধ্যে Chittagong Hill Tracts Regulation 1900-এর ১৮নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে rules for the adminstration of the Chittagong Hill Tracts-এর বিধিমালার ৩৪নং বিধিতে ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পাদিত হবে, ১২নং বিধিতে রেজিষ্ট্রি দলিল কিভাবে সম্পন্ন করা হবে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪নং বিধিতে পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণকে ভূমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর বিষয়ে মূলতঃ যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই রেগুলেশনের ৩৪নং বিধি অনুযায়ী যাবতীয় পদ্ধতি সম্পাদন পূর্বক ডেপুটি কমিশনারগণ রাষ্ট্রের পক্ষে এই রেগুলেশনের ৬ ও ৭নং বিধি বলে তারা বন্দোবস্তী প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। রেগুলেশনের সংশোধনীর সাথে এই ৩৪নং ধারাটাও বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। যেমন ১৯৭১ সালে একবার সংশোধন করা হয়েছিল। আর ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয় সরকারের নিজস্ব স্বার্থে।

১৯৭১ সালে ৩৪নং ধারা সংশোধন করা হয়েছিল তাতে পার্বত্য জেলাসমূহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে কোন স্থায়ী বাসিন্দাকে হস্তান্তর করতে পারতেন এবং বন্দোবস্তী দিতে পারতেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় যে সংশোধনী করা হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে, এখানে ১৫ বৎসর পর্যন্ত যদি অস্থায়ী বাসিন্দা কেউ বসবাস করেন বা ভিন্ন জেলার যদি কেউ অর্থাৎ অপাহাড়ী বা অউপজাতি ১৫ বৎসর ধরে বসবাস করেন তাদেরকেও ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বা হস্তান্তর করা যাবে।

এই প্রক্রিয়াধীনে আমরা দেখেছি যে, এরপর থেকেই মূলতঃ এখানে বাইরে থেকে অন্য জেলার লোকজনকে বসানো হয়েছে। তখন থেকেই এই অঞ্চলের যে মূল সমস্যা ভূমি নিয়ে সমস্যা উদ্ভব হয়েছে। বহিরাগত বসতি প্রদানকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সরকারের স্বার্থে মূলতঃ ১৯৭৯ সালের সংশোধনী করা হয়। এর ফলে বহিরাগত সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে যারা সরকারী বিভিন্ন আমলা, রাজনৈতিক দলের বা সেনা কর্মকর্তার

আত্মীয়স্বজন তারা স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহ করে এখানে অনেক জায়গা জমি বন্দোবস্তী এবং লীজ নিয়েছে। যার ফলে এখানকার ভূমি সমস্যাটা বিরাট আকার ধারণ করেছে।

আগে ডেপুটি কমিশনার যে কোন পাহাড়ীকে পৌর এলাকার ভিতরে বসতভিটার জন্য ৩০ শতক পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্তী মূলে হস্তান্তর করতে পারতেন, কৃষির জন্য পাঁচ থেকে দশ একর এবং শিল্প কারখানার জন্য পৌর এলাকার মধ্যে পঞ্চাশ একর জমি দিতে পারতেন। শিল্প কারখানার জন্য পৌর এলাকার বাইরে পাঁচ থেকে দশ একর এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রাবার বাগান বা অন্যান্য বাগানের জন্য পঁচিশ একর পর্যন্ত তিনি জমি দিতে পারতেন।

এখন দেখা যাক বন্দোবস্তী প্রক্রিয়াটা আসলে কিভাবে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে যে নিয়ম আছে তা হলো কোন লোক যদি কোন জমি বন্দোবস্তী পেতে চায় তাহলে তাকে জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটা আবেদন দিতে হবে। সে আবেদনে সংশ্লিষ্ট জমির ধরনসহ চৌহদ্দি উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট হেডম্যানের সুপারিশ অবশ্যই নিতে হবে। তারপর জেলা কানুনগো সরেজমিনে তদন্ত করে এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে শুনানীর জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শুনানীর পরে পূর্বানুমোদনের জন্য জেলা পরিষদে প্রেরণ করবেন এবং শুনানীর পর ডেপুটি কমিশনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন। এই অনুমোনের পর রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরের নিকট রাজস্ব খাতের শাখায় প্রেরণ করা হবে। এরপরে রেজিস্ট্রি শাখায় গিয়ে রেজিস্ট্রির জন্য তজিভূক্ত হবে এবং তারপর সংশ্লিষ্ট হেডম্যানের নিকট চিঠি দিয়ে সেটা হেডম্যানের বালাম বইয়ে তালিকাভূক্ত করা হবে। এরপর খাজনা আদায়ের যে procedure আছে তা সম্পন্ন করার পর অর্থাৎ খাজনা পরিশোধের পর বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৯৮৯ সালে জুলাই মাসে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হয়। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬৪নং ধারা মতে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন লাগবে অর্থাৎ জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া ভূমি বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে না। সে প্রেক্ষিতে এই পূর্বানুমোদনের ব্যাপারটা এখানে এসেছে। আগে কিন্তু সেটার প্রয়োজন ছিল না। ৬৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলায় যে কোন ভূমি বন্দেবস্তী, হস্ত ান্তর বা বেচাবিক্রির ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র রিজার্ভ ফরেষ্ট, ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকাসহ সরকারের নামে যে সমস্ত জায়গা-জমি আছে এগুলো বাদে অন্যান্য সকল জায়গা জমির ক্ষেত্রে এই আইনটি কার্যকর হবে। আর fringe land-এর ক্ষেত্রে মূল মালিককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডেপুটি কমিশনার বন্দোবস্তী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। এগুলো হচ্ছে ভূমি বন্দোবস্তী সম্পর্কিত আইনের বিধানসমূহ। একটা হচ্ছে জেলা পরিষদ আইনে; আরেকটা হচ্ছে হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশনে।

আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন পরবর্তীতে পার্বত্য চুক্তির ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের গেজেট মূলে, Chittagong Hill Tracts Regulation মূলে এবং এর সংশোধনীসমূহ বলে পার্বত্য জেলাসমূহে ডেপুটি কমিশনারগণকে ভূমি বন্দোবস্ত এবং স্থানীয়দের নিকট ভূমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য জেলাসমূহে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রবর্তন হওয়ার ফলে এই সমস্ত স্থানীয় সরকার পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যাতিরেকে জেলার বাসিন্দা নয় এরূপ কোন ব্যাক্তির নিকট কোন জায়গা-জমি হস্তান্তর করা যাবে না বলে বিধান জারী করা হয়।

এই প্রজ্ঞাপন জারির একবছর পর ১৯৯০ সালে বিশেষ কার্যাদি বিভাগের স্মারকমূলে আবার একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সেখানে বলা হচ্ছে যে, জেলা প্রশাসকগণ ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলে যে সমস্ত কার্যাদি সম্পাদন করেন সেগুলো সম্পূর্ণ বহাল থাকবে। অর্থাৎ এই আইনটা বহাল এবং কার্যকর

থাকবে মর্মে একটা আদেশ জারি হয়। এই আদেশে আরও বলা হয় যে, ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রবর্তিত হলেও উক্ত আইনের ২নং ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন না দেওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ গেজেট নোটিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত এই আইন বলবৎ হবে না। কিন্তু এরপর সরকার আর কোন গেজেট নোটিফিকেশন দেয়নি। ফলে বিধান অনুযায়ী এই আইনটি আর বলবৎ হয়নি।

এখানে দুটো বিশেষ শাসনবিধি; যথা একটা হলো ১৯০০ সালের রেগুলেশন সেটাও বলবৎ আছে আরেকটা হলো ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ এটাও বলবৎ আছে। এই দুটো আইন পরস্পর বিরোধী। একটাতে বলছে, পূর্বানুমোদন লাগবে। আরেকটাতে বলছে পূর্বানুমোদন না হলেও চলবে। এ সমস্ত জটিলতার মধ্যে আমাদের বন্দোবস্তী প্রক্রিয়াটা প্রায় অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উপরোক্ত প্রজ্ঞাপন দুটোতো এমনিতেই পরস্পর বিরোধী তার উপর ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪নং ধারায় বন্দোবস্তী, ইজারা, হস্তান্তরের বেলায় পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৮নং ধারা মতে পরিষদের বিধিমালা এবং ৬৯নং ধারা মতে প্রবিধান এখনো প্রণিত হয়নি। যার ফলে পরিষদ আইনের ৬৪নং ধারা মতে কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে অনুমোদন নেয়া হবে তা পরিষ্কার নয়। অপরদিকে হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশনের ৩৪নং ধারাও যদি অনুসরণ করতে হয় সেক্ষেত্রেও একটা সমস্যা আছে।

মোটকথা পরিষদ আইনের ৬৪নং ধারা মতে যে পূর্বানুমোদনের কথা বলা হয়েছে, সেই পূর্বানুমোদন কিভাবে নেযা হবে তা বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণিত না হওয়ার ফলে অস্পষ্ট রয়েছে। ফলতঃ বর্তমানে বন্দোবস্তী কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। আর তার উপর বহিরাগত সেটেলারদের অবস্থানও এই সমস্যাকে আরো জটিল করেছে। মূলতঃ নানা জটিলতার কারণে বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। আর এজন্য আমরা পার্বত্যবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এর সমাধান কিভাবে হতে পারে বা এ বিষয়ে কি করা যায় সে বিষয়ে আপনারা চিন্তা করবেন আশাকরি। পরবর্তীতে ওয়ার্কিং সেশন আছে আপনাদের জন্য। ঐখানে আপনারা চেষ্টা করবেন কিভাবে আমরা এ সমস্যাটার সমাধান করতে পারি।

এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, যে rule বা নীতিমালা আছে এগুলোর বাইরেও কিন্তু বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া চলছে। আমরা জানি যে, অনেক বহিরাগত সেটেলার যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয় তারা বিভিন্নভাবে এই পদ্ধতির বাইরে বন্দোবস্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অর্থাৎ তারা বন্দোবস্তী পেয়েছে। এগুলোর আইনগত ভবিষ্যৎ কি হবে? ভবিষ্যতে সেটা হয়ত আমরা বলতে পারবো। এভাবে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে rule বা নীতিমালার বাইরে বেআইনীভাবে অনেকগুলো বন্দোবস্তীর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আমি যতটুকু জানি বিশেষ করে বান্দরবান জেলায় এরকম অনেকগুলো বন্দোবস্তী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং লীজও দেয়া হয়েছে। তাহলে এগুলোর ভবিষ্যৎ কি হবে?

এরকম অবৈধভাবে যে সমস্ত জমি বন্দোবস্তী দেয়া হয়েছে এগুলো বাতিলের জন্য ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে পার্বত্য জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে। আমি যতটুকু জানি, এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা মাত্র বাতিল হয়েছে আর অধিকাংশ বহাল রয়েছে। এখন যেগুলো বাতিল হয়নি বা জেলা প্রশাসকগণ বাতিল করছেন না সে বিষয়ে কি করা যায়?

আসলে বিষয়টি হলো, জেলা প্রশাসকগণ সরাসরি মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের অধীনস্থ। সেজন্যে এই আদেশটা যদি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে আসতো তাহলে জেলা প্রশাসকগণ এটাকে গুরুত্ব সহকারে নিতেন এবং কার্যকর করতেন। যেহেতু এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এসেছে এবং সমন্বয় হয়নি কাজেই জেলা প্রশাসকগণ বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে নেয়নি। যে কয়েকটা বাতিল হয়েছে তাও

বোধ হয় একেবারে সরাসরি একসঙ্গে পদক্ষেপ নেয়ার ফলে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে- যে সমস্ত জমিগুলোর বন্দোবস্তী বিশেষ করে বান্দরবানে বাতিল করা হয়নি এগুলোর এখন কি হবে? যেমন ধরুন মুরং এলাকায় এরকম বন্দোবস্তী করে নিয়েছে, এখন সে এলাকার মুরংদের পক্ষে কি অন্য কোথাও গিয়ে এর সমাধান চাওয়া বলা সম্ভব?

তাই এগুলোর তথ্য সংগ্রহ করে কিভাবে বাতিলের ব্যবস্থা করতে পারি তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। ভূমি সমস্যাটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বড় সমস্যা। এই ভূমি সমস্যায় আমরা সবচেয়ে বেশী suffer করছি। কাজেই বসে থাকলে হবে না। এভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে যে, আমাদের সব জমিই চলে গেছে। কাজেই আমাদের আগেভাগেই একটা protective ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হবে। যে যে এলাকায় এ ধরনের অনিয়ম হচ্ছে সে সমস্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিরা যদি বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আইনী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন তাহলে হয়ত কিছুটা হলেও আমরা এগুলো রক্ষা করতে পারবো।

আর বন্দোবস্তীর ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ আইনের ৬৪নং ধারা এবং হিল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশনের ৩৪নং ধারা- এই দুটো বিধান ছাড়াও হিল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশনের ৫০নং ধারায় বলা হচ্ছে যে, ডিসির অনুমোদনের বাইরেও অর্থাৎ নিয়ম মাফিক বন্দোবস্তীর বাইরেও হেডম্যান তার সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে পাহাড়ীদেরকে বা স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে বসতভিটার জন্য ৩০ শতক পর্যন্ত জমি ব্যবহারের বা দখলে রাখার অনুমতি দিতে পারেন। এটা হলো চলমান বন্দোবস্তী প্রক্রিয়ার বাইরে অর্থাৎ বন্দোবস্তীর বাইরেও তিনি জমি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। এসব জমিগুলো হলো ভূমি বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া সম্পর্কীত বিষয়।

বন্দোবস্তীর পর এবার আমি আসছি "লীজ" প্রসঙ্গে। লীজের যে নিয়ম-কানুন আছে সচরাসর আমরা লক্ষ্য করি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন জমি লীজ বা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মৌজা হেডম্যানের একটা সুপারিশ দরকার হয় এবং জেলা প্রশাসকের নিকট লীজের সুপারিশসহ আবেদন করতে হয়। ১৯০০ সালের রেগুলেশনের ৩৪নং ধারার ৫ উপবিধিতে জেলা প্রশাসকগণের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কাজেই পূর্বানুমোদন ব্যতিত জেলা প্রশাসকদের লীজ প্রদান বেআইনী। বর্তমানে বিশেষ করে বান্দরবানে এরকম পূর্বানুমোদন বিহীন লীজ প্রদান হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে যা পত্রপত্রিকায়ও চলে এসেছে। এছাড়া পার্বত্য চুক্তিতে অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত লীজ বাতিলেরও বিধান করা হয়েছে। সেগুলো অতিদ্রুত বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। সবাই ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু সমস্যা

সুধাসিন্ধু খীসা[২]

ক. পটভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্বাস্তু সমস্যা একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা (Chronic Disease)। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ মূলতঃ তিন পর্যায়ে উদ্বাস্তু হয়। এখানে দুই ধরনের উদ্বাস্তু দেখা যায় - আভ্যন্তরীণ (দেশের মধ্যে স্থানান্তরিত) ও বাহ্যিক (দেশান্তরিত)। যথা-

১. ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সময় উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত-
   (ক) দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু;
   (খ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ (দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়);

২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সীমান্ত থেকে গুলিবর্ষণের ফলে উদ্বাস্তু ও তার পরবর্তী সময়ে মিজো বিদ্রোহী দমনের নামে ব্যাপক অভিযানের ফলে উদ্বাস্তু সৃষ্টি;

৩. ১৯৭৫ সাল থেকে আন্দোলন দমনের ফলে উদ্বাস্তু সৃষ্টি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার ইতিহাস। বৃটিশ শাসনামল ও পাকিস্তান শাসনামলে এই দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্মদের কোনভাবে ছিল না শাসন ক্ষমতার অংশীদারিত্ব, ছিল না সত্যিকার অর্থে কোন গণতান্ত্রিক অধিকার। যখনই জুম্ম জাতির উপর কোন না কোনভাবে নেমে আসতো কঠোর শাসন, শোষণ, নির্যাতন তখনই তারা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সন্ধানে যেতো পালিয়ে। গণতান্ত্রিক অধিকার অনুপস্থিতির কারণে ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালানোই ছিল তাদের একমাত্র পথ। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর লক্ষাধিক জুম্ম হারালো তাদের জমি ও বাস্তুভিটা। কোন প্রতিবাদ ছাড়াই ছাড়লো দেশ, পাড়ি জমালো ভারত ও বার্মায়। তাদের আর নিজের দেশে ফেরা হলো না।

পঞ্চাশ দশকের শেষ ও ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে জুম্মদের শিক্ষিত যুবশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ বুঝতে পারলো পৃথিবী নামক গ্রহে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সূচাগ্র পরিমাণ জায়গাও তাদের জন্য অবশিষ্ট নেই। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে ফাঁকি দিয়ে পার্বত্য জনতার অজ্ঞাতে ও অগোচরে উক্ত শাসনবিধিকে করা হয় দফায় দফায় কাটাছেড়া। ফলে প্রশাসনযন্ত্রের আশীর্বাদে হু হু করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হয় অ-উপজাতীয়দের অনুপ্রবেশ। পাকিস্তান শাসনামলের শেষ দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন যখন তুঙ্গে সে সময় এবং তার আগে পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শাসনামলে এবং বাংলাদেশের সূচনা লগ্নে বাম, মধ্য ও ডানপন্থী প্রায় সকল রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিত্ব ও নেতাদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কোন রাজনৈতিক নেতাই তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি, অনেকে সমস্যার কথা ধৈর্য্য সহকারে পর্যন্ত শুনতে রাজি ছিলেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং অত্যাচর-নিপীড়ন বেড়ে গেছে বহুগুণে এবং অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত প্রশাসনযন্ত্রের ছত্রছায়ায়।

---

[২] সুধাসিন্ধু খীসা ঃ সদস্য, প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স এবং আহ্বায়ক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উপজাতীয় রীতিনীতি বিষয়ক কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।

চিন্তা-চেতনায়, জ্ঞান-গরিমায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রগামী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে উঠলো অধিকার আদায়ের আন্দোলন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ যখন হলো একেবারে রুদ্ধ তখন সে আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনে হলো রূপান্তরিত। আন্দোলন যখন সশস্ত্র রূপ ধারণ করলো শাসক-শোষকগোষ্ঠী হয়ে উঠলো ব্যতিব্যস্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য, চালাতে শুরু করলো অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। শাসক-শোষকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের লালিত নগ্নরূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো। শুরু হলো শক্তি প্রয়োগ করে জুম্মদের উচ্ছেদ কার্যক্রম। সেই সাথে চললো সরকারী উদ্যোগে হাজার হাজার অ-উপজাতীয় পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন। পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের তথা বিশ্বের মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারলো শাসক-শোষকগোষ্ঠীর আসল রূপ। অনেক পরেই দেশের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিত্ব কিছুটা বুঝতে পারলো।

প্রতিটি বস্তুর থাকে দু'টো দিক এবং তা পরস্পর বিরোধী। ভালোর সাথে মন্দের, হাসির সাথে কান্নার, পতনের সাথে উত্থানের, জন্মের সাথে মৃত্যুর, প্রগতির সাথে প্রতিক্রিয়াশীলতার, জয়ের সাথে পরাজয়ের ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে আন্দোলনেরও দু'টো দিক রয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর চুক্তি করে কিছু অধিকার আদায় হয়েছে। অপরদিকে অধিকাংশ আদিবাসী জুম্ম হয়েছেন বাস্তুচ্যুত। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক কাঠামো ভেঙে হয়েছে চুরমার। ষাট হাজারেরও অধিক মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পাড়ি জমিয়েছে ভারতে, দুর্বিসহ শরণার্থী জীবন কাটিয়েছে প্রায় এক যুগ ধরে। আর যারা স্বদেশের মধ্যে রয়েছে, বাস্তুচ্যুত হয়নি সে সংখ্যা শতকরা দশ জনেরও কম হবে নিঃসন্দেহে। সাধারণভাবে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তা বাস্তব সত্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের বাস্তুহারা জীবন শুরু হয় মূলতঃ ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ হওয়ার পর হতে। সে সময় এক লাখের অধিক জুম্ম উদ্বাস্তু হয়। তাদের যথাযথ পুনর্বাসন হয়নি। তার স্থিতিশীল অবস্থা আসতে না আসতে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম। মুক্তি সংগ্রামের সময় শত শত পরিবার উদ্বাস্তু হয়। বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ফেনী অঞ্চলের অধিকাংশ জুম্ম বাস্তুচ্যুত হয়। কোন সরকার পরিকল্পিতভাবে তাদের পুনর্বাসন দেয়নি। বিগত দুই যুগ ধরে বিরাজ করেছিল অস্থিতিশীল ও অশান্ত পরিস্থিতি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ। সাধারণতঃ মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি জীবনধারা তার অর্থনৈতিক জীবনধারাকে অনুসরণ করে থাকে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজ না করলে স্বাভাবিকভাবে তার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি জীবনধারাও স্থিতিশীল হয় না। তাই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি মূল্যবোধ খুবই অস্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজ করছে। এ সমস্ত বিষয় স্মরণে রেখে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করাকে গুরুত্ব দিয়ে চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করে।

খ. জুম্ম শরণার্থী সমস্যা সমাধানে সরকারের উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার ৮ এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে তথা সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত টাস্কফোর্স ২০ জানুয়ারী ১৯৯৮ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুনর্গঠন করে।

- সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে চুক্তি-
  (ক) ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে ১৬ দফা প্যাকেজ চুক্তি
  (খ) ৯ই মার্চ ১৯৯৭ সালে ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি;

- প্যাকেজ চুক্তি দু'টির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য; প্যাকেজ সুবিধাদি দুইভাবে ভাগ করা যেতে পারে-
  (১) অর্থনৈতিক সুবিধাদি
  (২) ভূমি সংক্রান্ত অর্থাৎ ভূমি ফেরৎ দান সংক্রান্ত

- দু'টি প্যাকেজ চুক্তির ভূমি সংক্রান্ত দফাসমূহ-

  (১) ১৬ দফা চুক্তির ১৪নং দফায় উল্লেখ আছে যে,
  The request for the return of paddy field to the actual owners is accepted.

  (২) ২০ দফা চুক্তির ১১নং দফায় বলা আছে যে,

  (ক) প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করা হবে এবং ধর্মীয় স্থানসমূহ পুনর্বহাল করা হবে। উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করা হবে না।

  (খ) অনধিক ৭০ (সত্তর) টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে।

- টাস্ক ফোর্স গঠন

১। ১৯৯৭ সালের ৮ এপ্রিল (চুক্তির আগে) তৎকালীন এমপি কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট টাস্ক ফোর্স গঠন; অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন-
  ১) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ - সদস্য
  ২) বীর বাহাদুর, সংসদ সদস্য, বান্দরবন পার্বত্য জেলা - সদস্য
  ৩) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ - সদস্য সচিব
  ৪) আঞ্চলিক কম্যান্ডার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, খাগড়াছড়ি অঞ্চল - সদস্য
  ৫) অক্ষয় মুনি চাকমা, শরণার্থী প্রতিনিধি - সদস্য
  ৬) সমীর কান্তি দেওয়ান, শরণার্থী প্রতিনিধি - সদস্য

২। ২০ জানুয়ারী ১৯৯৮ সালে তৎকালীন এমপি দীপংকর তালুকদারের নেতৃত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন; অন্যান্য সদস্যরা হলেন-
  ১) বীর বাহাদুর, সংসদ সদস্য, বান্দরবন পার্বত্য জেলা - সদস্য
  ২) স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
  ৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
  ৪) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
  ৫) ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
  ৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি - সদস্য
  ৭) প্রত্যাগত শরণার্থীদের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
  ৮) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম - সদস্য সচিব

৩। ২০০৩ সালের ২৯ নভেম্বর সমীরণ দেওয়ানের নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট টাস্ক ফোর্স কমিটি পুনর্গঠন

১) সুধাসিন্ধু খীসা, প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি - সদস্য
২) হারুন উর রশিদ, প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ - সদস্য
৩) সুজিত দেওয়ান, প্রতিনিধি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ - সদস্য
৪) মোঃ হারিফ উদ্দিন, প্রতিনিধি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ - সদস্য
৫) সন্তোষিত চাকমা বকুল, প্রতিনিধি, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি - সদস্য
৬) জাফর আহমদ (সরকার মনোনীত) - সদস্য
৭) মেজর মোঃ হামিদুন্নবী চৌধুরী, প্রতিনিধি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন - সদস্য
৮) মোঃ আবদুল মান্নান, উপসচিব (প্রশাসন) ও প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য
৯) আশরাফুল মকবুল, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ - সদস্য সচিব

- শরণার্থীদের সাথে স্বাক্ষরিত প্যাকেজ চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

(ক) ২০ দফা চুক্তির আওতায় ১২,২২২ পরিবারের ৬৪,৬০৯ জন প্রত্যাবর্তন করে। এছাড়া ১৬ দফা চুক্তি ও স্বউদ্যোগে প্রত্যাবর্তন করে।

(খ) অর্থনৈতিক সুবিধাদি অধিকাংশ বাস্তবায়িত হয়।

(গ) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি মোটেও বাস্তবায়িত হয়নি।

- অবাস্তবায়িত ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

বসতবাড়ী ফেরৎ পায়নি	১,৮৭৪ পরিবার
বাগানবাড়ী ফেরৎ পায়নি	১,৫১১ পরিবার
ধান্য জমি ফেরৎ পায়নি	১,২৭০ পরিবার
জুম মহল ফেরৎ পায়নি	৪,৬৭১ পরিবার
মোট	৯,৩২৬ পরিবার

অন্যান্য অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ

প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০ পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি	৬টি বিদ্যালয়
স্থানান্তরিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জন

- সেটেলার কর্তৃক জমি বেদখল থাকার কারণে দীঘিনালায় ট্রান্সজিট ক্যাম্পে (সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থী অবস্থান করছে

গ. আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ ঃ প্রত্যাগত জুম্ম শরনার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিষয়-

  ১। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

  ২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিধান;

- আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের একনজর-
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক দীপংকর তালুকদারের নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।
  - এই টাস্ক ফোর্সের ১১ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
  - জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় প্রথম ৯টি বৈঠকে যোগদান করেন।
  - ৯ম সভায় তারা ওয়াক আউট করেন;
  - ১১তম সভায় সরকার একতরফাভাবে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা ও প্যাকেজ সুবিধা ঘোষণা করে।
  - সমীরণ দেওয়ানের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত দশ সদস্য বিশিষ্ট টাস্ক ফোর্স বলবৎ রয়েছে।
  - এই টাস্ক ফোর্সের মোট ৪ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি নেই।
  - কোন আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা হয়নি।

<u>প্রথম বৈঠক (২১ মার্চ ১৯৯৮) - প্রারম্ভিক আলোচনা অনুষ্ঠিত</u>

<u>দ্বিতীয় বৈঠক (৬ জুন ১৯৯৮)</u>

- জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয়-

  (ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা;

  (খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা;

  (গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা;

  (ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবণ প্রদান করা;

  (ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা;

  (চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

  (ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;

  (জ) চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা;

  (ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা;

  (ঞ) ঋণ মওকুফ করা;

  (ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

তৃতীয় বৈঠক (২৭ জুন ১৯৯৮)

- ২৭ জুন ১৯৯৮ অনুষ্ঠিত ৩য় সভায় আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় বিষয়ক নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়-

  "১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট হতে ১৯৯২ সনের ১০ আগষ্ট (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচিত হবেন।"

- উক্ত ৩য় সভায় আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

  ইউনিয়ন পর্যায়ে ঃ

১.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান	-	আহ্বায়ক
২.	জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান	-	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার	-	সদস্য

  থানা পর্যায়ে ঃ

১.	সংশ্লিষ্ট থানার টিএনও	-	আহ্বায়ক
২.	নিরাপত্তা বাহিনীর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪.	থানা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫.	জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট থানার ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	সংশ্লিষ্ট থানার হেডম্যান সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য

এই সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণের কাজ ৩১ আগষ্ট ১৯৯৮-এর মধ্যে সমাপ্ত করা এবং থানা কমিটিতে উক্ত তালিকা জমা দেয়া। থানা কমিটি কর্তৃক উক্ত ফরম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করা এবং ফরমের তালিকায় কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তা নিস্পত্তির পর পূর্ণাঙ্গ তালিকা টাস্ক ফোর্সের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

চতুর্থ বৈঠক (২০ জুলাই ১৯৯৮)

- ২০ জুলাই ১৯৯৮ অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভায় আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু তালিকা প্রস্তুত বিষয়ক ফরম্যাট সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।

- সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু বিষয়ক সংজ্ঞার সাথে নিম্নোক্ত অংশটি কোন অলোচনা ব্যতীত ৩য় বৈঠকের কার্যবিবরণীতে সংযোজন করা হয়-

  "তবে একই সাথে ভিন্নভাবে অউপজাতীয়দের পূনর্বাসন করা হবে"।

- সিদ্ধান্ত বহির্ভূত উক্ত বাক্যাংশের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিদ্বয় তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়ার দাবী জানান।

পঞ্চম বৈঠক (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

- ৪র্থ বৈঠকের কার্যবিবরণীতে কোন আলোচনা ছাড়াই নিম্নোক্ত অংশটি সিদ্ধান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়-

  "তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকগণ আলোচনাক্রমে অউপজাতীয় উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণের জন্য ফরম্যাট তৈরী করবেন এবং সেই মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন"।

- স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ থেকে নিম্নোক্ত চুক্তি পরিপন্থী সরকারী আদেশপত্র [স্পেঃএ্যাঃবিঃ(ডকু)-৭৮/৯৮/১৮৫তারিখ ১৯-০৭-৯৮ মূলে] জারী করা হয়-

  "২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের সভার কার্যবিবরণীর তৃতীয় পৃষ্টার 'ক' সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী পুনর্বাসন ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের কার্যপরিধি অনুসারে একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় ও অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ ও তাদের পুনর্বাসন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"।

- চুক্তি পরিপন্থী উক্ত আদেশপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করা হয়।

ষষ্ঠ বৈঠক (৯ মার্চ ১৯৯৯), সপ্তম বৈঠক (২৯ এপ্রিল ১৯৯৯) ও অষ্টম বৈঠক (৪ আগষ্ট ১৯৯৯)

- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম বৈঠক পর্যন্ত মুখ্যতঃ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার নিয়ে এবং সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা না করা বিষয়ে তুমুল বিতর্কের মধ্যে সীমিত থাকে।

নবম বৈঠক (২২শে নভেম্বর ১৯৯৯)

- ২২শে নভেম্বর ১৯৯৯ অনুষ্ঠিত নবম বৈঠক স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার না করার প্রতিবাদে note of decent প্রদানের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় সভা ত্যাগ করেন।

দশম বৈঠক (১৪-১৫ মার্চ ২০০০)

- উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় প্রতিবাদ স্বরূপ অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

একাদশ বৈঠক (১৫ মে ২০০০)

- ১৫ মে ২০০০ অনুষ্ঠিত একাদশ সভায় জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে সরকার একতরফাভাবে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় ও অউপজাতীয় উদ্বাস্তু তালিকা ঘোষণা করেন। একতরফাভাবে ঘোষিত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা ঃ

জেলা	উপজাতীয় পরিবার	অউপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫,৫৯৫	১৫,৫৯৫	৫১,১১১
বান্দরবান	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২
খাগড়াছড়ি	৪৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮,১৫৬	১,২৮,৩১৪

প্যাকেজ সুবিধাদি ঃ

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান;

২) উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য-
   (ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করা;
   (খ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা;

৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;

৪) আয়বর্ধন কর্মসূচীর জন্য থোক বরাদ্দ ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।

বিগত সরকারের আমলে ২০ জানুয়ারী ১৯৯৮ তারিখে পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের সর্বমোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় সভা হতে সপ্তম সভা পর্যন্ত নানা কৌশল অবলম্বন করে অউপজাতীয়দেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পুনর্বাসন প্রদানের চেষ্টা সরকার অব্যাহত রাখে। তৃতীয় সভায় আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকাভূক্তকরণের ফরমেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফরমের মাধ্যমে অউপজাতীয়দেরকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে তালিকাভূক্ত করার কাজ শুরু হয় এবং সরকার কর্তৃক তা টাস্ক ফোর্সে অন্তর্ভূক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়। এটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য হিসেবে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি এ বিষয়ে গোড়া থেকেই বিরোধীতা করে এসেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আভ্যন্ত রীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অউপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মৌজার হেডম্যানদের উপর নানা কায়দা-কৌশল করে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা চালানো হয়। যেমন -

১) অধিকাংশ হেডম্যানদেরকে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অউপজাতীয় ফরমে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য নানা ভয় প্রদর্শন ও আইনের ফাঁক-ফোকর দেখিয়ে অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়।

২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। তার কারণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিশেষতঃ টিএনও-দের দ্বারস্থ হতে হয়। ফলতঃ আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ চেয়ারম্যানগণ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেননি।

৩) অশান্ত পরিস্থিতির কারণে অনেক মৌজায় উপজাতীয় জনসাধারণ নিজ মৌজা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তদস্থলে বা ঐসব মৌজায় সমতল হতে অউপজাতীয়দের তথাকথিত পুনর্বাসন দেয়া হয় এবং উক্ত পুনর্বাসিত অউপজাতীয়দের মধ্যে কিছু সংখ্যক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কতেক মৌজায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে অউপজাতীয় হেডম্যানও নিয়োগ করা হয়। এসব অউপজাতীয় চেয়ারম্যান ও হেডম্যানগণ তাদের মৌজায় বা ইউনিয়নে কোন উপজাতীয় নেই বলে উপজাতীয় ফরমে স্বাক্ষর প্রদানে বিরত থাকে।

৪) আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংজ্ঞা অনুসারে অউপজাতীয় ফরমে চেয়ারম্যান ও হেডম্যানগণ স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাগণ নানাভাবে উপজাতীয় চেয়ারম্যান ও হেডম্যানদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বেশ কয়েকটি থানায় থানা কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক নানা অছিলায় আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা হতে উপজাতীয়দের বাদ দেয়া হয়।

- সমীরণ দেওয়ানের নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট টাস্ক ফোর্স কমিটি-
  - টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ শে নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
  - উক্ত ৪টি বৈঠকে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় উপস্থিত থাকেন।
  - পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
  - সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পুনর্বাসনের বিষয়টা রাজনৈতিক; তাই এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীপরিষদ কমিটিতে প্রেরণ করার প্রস্তাব করা হয়।
  - সরকার পক্ষ দীঘিনালায় ট্রান্সজিট ক্যাম্পে অবস্থানকারী ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থীকে অন্তবর্তীকালীন পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি ও শরণার্থী প্রতিনিধি এর বিরোধীতা করেন;
  - সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো অচল হয়ে পড়েছে।
  - আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।
  - ফলতঃ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ঘ. উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে অউপজাতীয়দের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনকরণ চুক্তিরই পরিপন্থী। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতীয়দের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে এই মর্মে খবর প্রচারিত হওয়ায় পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতীয় অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে চুক্তি সম্পাদনের পর অনেক অউপজাতীয় পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পড়েছে এবং প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ ঘটছে। সরকার কর্তৃক অবৈধভাবে পুনর্বাসিত শত শত অউপজাতীয় বিগত অশান্ত পরিস্থিতির সময়ে স্ব স্ব স্থানে/জেলায় নিজ উদ্যোগে ফিরে গেছে কিন্তু বর্তমানে অউপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের বিষয়টা ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হওয়ায় সেই সকল অউপজাতীয়রা পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় ফেরত আসতে শুরু করে।

একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতি, অন্যদিকে টাস্ক ফোর্সের কার্যকলাপ চুক্তির পরিপন্থী বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি খুবই জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের স্বার্থে চুক্তি মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণভাবে পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা একান্তই অপরিহার্য ও বাঞ্ছনীয় বলে পার্বত্যবাসী মনে করে। জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো-

১। আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সরকারের আদৌ কোন সদিচ্ছা নেই;

২। পক্ষান্তরে বসতিস্থাপনকারী বহিরাগতদের পুনর্বাসনই হচ্ছে সরকারের মূল পরিকল্পনা; ফলে-

- ✓ আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বসতিস্থাপনকারী বহিরাগতদের পুনর্বাসনের সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পুনর্বাসন প্রাপ্তির আশায় সমতল জেলাগুলো থেকে ছিন্নমূল বাঙ্গালী পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ জোরদার;
- ✓ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় কতিপয় মৌলবাদী সংগঠন ও স্বার্থান্বেষী মহল সুসংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিতভাবে তা বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে;

৩। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করা;

৪। জুম্মদের উচ্ছেদের মাধ্যমে ভূমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া।

ধন্যবাদ

Participants List
Workshop on Land Rights Issues in Chittagong Hill Tracts
23-24 November 2005
Sabarang Restaurant, Rangamati

Participants List of Rangamati Hill District

Sl No	*Name*	*Designation and Organization*
1.	Ms. Alpana Chakma	Women Representative, Balukhali
2.	Mr. Ushala Roaza	Honorable Member, Rangamati Hill District Council
3.	Ms. Mamata Chakma	Mouza Forest Reservation Samiti
4.	Mr. Nikilesh Chakma	Taungya
5.	Mr. Lalit C Chakma	Secretary, HTNF
6.	Ms. Sagarika Roaza,	Gargangtali Mahila Samity
7.	Ms. Khushi Nahar	Adhi O Staiye Bangali Kalyan Parishad
8.	Ms. Suproba Chakma	Hill Women Federation
9.	Ms. Shuva Lata Chakma	Women Representative, Balukhali
10.	Mr. Shayma Ratan Chakma	Chairman, Aima Chara UP
11.	Mr. Cha Thwai Roaza	Chairman, Farua UP
12.	Mr. Bishya Priya Chakma	Rangamati
13.	Ad. Shaktiman Chakma	Chairperson, HTNF Rangamati District Committee
14.	Mr. Lal Cwhuak Liana	Pangkhua, Ranagamati
15.	Keo Jachai Marma	Rajasthali Pulp Wood Project
16.	Ching Sha Prue Marma	Rajasthali Pulp Wood Project
17.	Ms Ranjita Chakma	Mubachari Shramajibi Mahila Kalyan Samity
18.	Mr. Sukriti Ranjan Chakma	Chief Executive, CHT Regional Council
19.	Ad. Susmita Chakma	Rangamati
20.	Mr. Arun Laibre Shaw	Rajasthali, Rangamati
21.	Ms. Nai Pru Marma	UP Member, Balikhali, Rangamati
22.	Mr. Chand Roy	CODEC, Rangamati
23.	Ms. Jayati Chakma	Parbattya Chattagram Mahila Samity, Rangamati
24.	Ad. Bhabatosh Dewan	Secretary, Maleya
25.	Mr. Udvasan Chakma	Member Secretary, Kapaeeng
26.	Ms. Tuku Talukdar	Organising Secretary, MfPFLR
27.	Mr. Sudhatta Bikash Tanchangya	General Secretary, MfPFLR
28.	Mr. Goutam Kumar Chakma	Member, CHT Regional Council
29.	Mr. Mangal Kumar Chakma	Ex-Advisor, Hill Tracts NGO Forum

30.	Mr. Devasish Chakma	Hill Tracts NGO Forum
31.	Ms. Manisha Talukdar	Hill Tracts NGO Forum
32.	Ms. Hima Chakma	Hill Tracts NGO Forum
33.	Mr. Bablu Chakma	Hill Tracts NGO Forum
34.	Mr. Binoy L Chakma	Accountant, HTNF
35.	Mr. Sudipta Chakma	Hill Tracts NGO Forum
36.	Mr. Binoy Chakma	Hill Tracts NGO Forum
37.	Mr. Dipujjal Khisa	Hill Tracts NGO Forum
38.	Mr. Suchitra Kr. Chakma	
39.	Mr. Goutam Dewan	Convenor, Movement for Protection of Forest and Land Rights
40.	Mr. Shanti Moy Chakma	CHT Correspondent, The Bangladesh Observer
41.	Mr. Ahmad Mia	Karbari, Jagrabil Mouza
42.	Md. Jamal Uddin	Abas. R., Giridarpan, Rangamati
43.	Mr. Supriyo Chakma	Prothom Alo

Participants List of Bandarban Hill District

Sl No	*Name*	*Designation and Organization*
1.	Mr. Ali Ahmed	Global Mission, Bandarban
2.	Mr. Zumlian Amlai	Chairperson, MfPFLR
3.	Mr. Ching Hla Mong	Chak, Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity
4.	Mr. Ranglai Mro	Mro-Chet, Bandarban
5.	Ms. Meyo Ching	Hill Women Fedreation, Bandaraban
6.	Mr. Paul Dhamanik	TYMU, Bandarban
7.	Mr. Dendoha Jolai Tripura	HTNF Bandarban District Committee
8.	Mr. Mong Thoai Ching	Secretary, Headmen Association, Bandarban
9.	Mr. L Dhalian	Community Advancement Forum
10.	Sugata Chakma	Mro-Chet
11.	Pre Pong Mro	Mro-Chet
12.	Sawpan Chak	Chetana
13.	Sahlafrue Marma	Eco Development
14.	Md. Zahangir Alam	N Z Ekata Mohila Samity, Lama, Bandarban

Participants List of Khagrachari Hill District

Sl No	*Name*	*Designation and Organization*
1.	Mr. Bishwa Kalyan Chakma	UP Chairmen Association, Khagrachari
2.	Ms. Jarita Chakma	President, Parbattya Chattagram Mahila Samity
3.	Mr. Kanak Baran Tripura	Zabarang Kalyan Samity, Khagrachari
4.	Mr. Ashok Kumar Chakma	Trinamul Unnayan Sangstha, Khagrachari
5.	Mr. Bakul Chandra Chakma	Jumma Refugee Welfare Association
6.	Mr. Mong Kya Sing	RLT
7.	Mr. Sakti Pada Tripura	President, Headmen Association, Khagrachari
8.	Mr. Chandra Kiran Tripura	Representative of Rubber Planter
9.	Mr. Mukta Ranjan Chakma	Humanity Welfare Association
10.	Chai Thowai Marma	President/Chief Executive, BRAPA

Participants List of Dhaka

Sl No	*Name*	*Designation and Organization*
1.	Mr. Hussain Sahid Sumon	Programme Office, HR-GG, PSU-RDE/Danida
2.	Mr. Intiaz Mahmud	Researcher, Queens University, Belfast, United Kingdom

আয়োজক সংগঠনের পরিচিতি

হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম

(পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় এনজিওদের এসোসিয়েশন)

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় এনজিওগুলোর নেতৃবৃন্দ ১৯৯৯ সালে তাদের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এবং তাদের কর্মদক্ষতাকে সুদৃঢ় করার মানসে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম (এইচটিএনএফ) গঠন করেন। এটি এ অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাসমুহকে জনকল্যাণমুখী ও পরিবেশমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে। এ অঞ্চল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আদিবাসী অধ্যুষিত একমাত্র অঞ্চল, যেটি তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, স্বকীয় ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে ভিন্ন। এ অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা যথা- রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে বসবাসরত বিভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি আদিবাসী পাহাড়ি জাতিসহ স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীগণ সকল ক্ষেত্রে সুযোগ বঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। অতীতের সরকারগুলোর ভুল উন্নয়ন নীতি গ্রহণ এবং আড়াই দশক ধরে সংঘাতময় পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে সর্বদা বঞ্চিত ছিল।

বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নমূলক কাজের সহায়ক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবেশে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে যে নিজস্ব ধারণা আছে, তার যথাযথ মূল্যায়ণ, স্থানীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দান, তথ্য সংগ্রহ, আদান-প্রদান ও প্রসারের ব্যবস্থা, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভূমিকা পালনসহ সকল ক্ষেত্রে সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নতির লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চল ভিত্তিক স্থানীয় উদ্যোগী ও অগ্রসর শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবীর ভিত্তিতে এখানে গড়ে তুলে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন। এসব উন্নয়ন সংগঠন এতদাঞ্চলে প্রকৃত ও অর্থবহ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের এ জনমুখী ও পরিবেশমুখী উন্নয়ন সাধনের তাড়না থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এসব স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমুহ গঠন করে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম।

Kapaeeng

An Indigenous People's Human Rights Organization of Bangladesh

'Kapaeeng' is a term derived from indigenous Khumi language, meaning 'Rights'. Kapaeeng is a human rights organization, which was established in 2003 with the view to working for promotion and protection of the rights of indigenous peoples of the country. As it knows that the indigenous peoples being the most vulnerable sect within the country are always neglected and victims of various human rights violations. They are deprived of basic rights guaranteed by the constitution of the State and international legal instruments. So it is committed to help the victimized indigenous peoples by providing legal supports and other substantive assistances.

It is originally a Dhaka base organization. Some trainings and workshops have already been conducted by Kapaeeng jointly with some organizations. It has also observed some internationally recognized days including World Human Rights Day and International Mother Language Day. Kapaeeng is aiming at establishing a strong network and working closely with organizations and individuals working on indigenous peoples issues and rights in local, national and international levels.

Taungya

(An organization for Indigenous Culture, Environment & Socio-Economic Advancement)

The word **"Taungya"** is rooted in the traditional culture of all the indigenous peoples of the Chittagong Hill Tracts. It is related to the Marma word "ya", Tripura word "gaireng" and the Chakma and Tanchangya word, "taung", all of which are related to the culture of swidden or jum-cultivating societies. Today, in agro-forestry technology, "Taungya" is also the name given to the system of raising tree plantations through an innovation to the swidden or jum method of agriculture.

Taungya was formed in 1995 as an unincorporated body. It was called the Committee for the Protection of Indigenous Culture. The primary focus was on indigenous culture because it was felt that the cultural fabric of indigenous society was being threatened by external interventions that were not in conformity with the rights, needs, and aspirations of the peoples of the Chittagong Hill Tracts (CHT). Later the scope of the organization was broadened to include the themes of development and environment, thereby also employing a wider perspective on indigenous culture. The organization was also renamed Taungya, and was finally registered with the Department of Social Welfare in 1998 and with the NGO Affairs Bureau in 2001. All the General Council and Executive Committee Members are voluntary members of the organization. Taungya Executive Council has 11(eleven) members headed by Raja Devasish Roy. Taungya's general council consists of 42 members.

The major objective of Taungya includes the following:

(i) The protection and preservation of indigenous culture and knowledge systems; (ii) The preservation of the environment, the protection of the rights of indigenous peoples, including women and children; and (iii) The achievement of educational and socio-economic advancement by all, and in particular, by disadvantaged communities.

Target Group: Its main target groups belong to the disadvantaged sections of CHT society, especially those living in the remote and semi-remote areas.

Working Areas and Experience: At present Taungya is working with Danida for VCF Project (Protection of Village Common Forest in the CHTs) in Barkal, Longadu and Rangamati Sadar Upazila. Taungya is also the partner of CHTDF, UNDP for Community Empowerment Project (CEP) for Bilaichari Upazila. A solar-powered household electricity project has facilitated by installation of 15

solar-powered units at Digholibag village under Sadar upazilla of Rangamati district with LGED funded by UNDP.

Taungya worked with WFP in support of RMP (Rural Road Maintenance Programme) and VGD (Vulnerable Group Development Programme). Taungya also participated in the CHOLEN (CHTs Children opportunities for Learning Enhancement) in Partnership with CARE-BANGLADESH, which was come to end in December 2004.

Other major activities done by Taungya are publication of Books, indigenous arts and crafts articles of historical value, literary material, photographs, audio and videotapes (continuing).

Series of workshop, Mosquito net distribution and free medical service

Maleya

(An associate organisation for develoment agencies)

Maleya has formed in 2003 mainly aimed to facilitate the capacity raising process of CHT NGOs. MALEYA's major strategic objectives include the strengthening of the capacities of major development and human rights actors of the CHT region, such as rural communities, local NGOs, community-based organizations, people's organizations, and mass-based organizations, among others.